

অস্তিত্ব

আশাপূর্ণা দেবী



মডেল বুক হাউস ৷ ৭৮/৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুন্দরীল মন্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

রক
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মন্ড্রণ
ইম্প্রেসন্স হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মন্ড্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মন্ড্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

উৎসর্গ

শ্রীরথেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত

স্নেহানুপদেশ

আমাদের প্রকাশিত
লেখিকার অন্য বই
বাছাই গল্প
আমি ও আপনারা
জরিপ
যে যেখানে ছিল
অফুরন্ত
প্রতীক্ষার বাগান

ଅକ୍ଷିତ୍

ପ୍ରଥମ ପର୍ବ

উত্তর-মধ্য কলকাতায় দুশো আড়াইশো বছরের পুরনো বাড়ি দুর্লভ নয়, কে জানে তার থেকে বেশী বয়সেরও আছে কিনা। তবে তারা তো ‘বাড়ি’ নয়, প্রাসাদ। পরিচয়ের ক্ষেত্রে ‘রাজপ্রাসাদ’।

বড় বড় রাস্তায় বৃকের উপর, অথবা নেহাৎই সরু সংকীর্ণ গলির বক্ষপঙ্করের খাজে খাজে অনেকখানি অনেকখানি জমি জুড়ে অবস্থিত রাজা মহারাজদের সেই সব বিশালদেহী প্রাসাদদের বার্ষিক্যজীর্ণ পতনোন্মুখ অথবা অধপতিত অথচ আভিজাত্য গম্ভীর চেহারা, আজকের পথচারী দর্শককে একটা দার্শনিক নিঃশ্বাস না ফেলিয়ে ছাড়ে না।

হয়তো এই অকারণ বিশ্বৃতি, অকারণ বাহুল্য, আর অহেতুক কারুকার্যের ঘটা প্রাসাদ-পতিদের বেপরোয়া অপচয়ের নমুনাই দাখিল করে, তবু তার অন্তরালে একটা ছুরিয়ে যাওয়া কালের সমারোহের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এক একটি প্রতি-পত্তিশালী বিরাট পুরুষের অথবা এক একটি প্রতিষ্ঠাখ্যাত পরিবারের জীবনসাধনা, কল্লনাসম্পদ, শিল্পবোধ, রুচিবোধ, সৌন্দর্যস্পৃহা আর দরাজ দিলের ইতিহাস।

কিন্তু এটা কী ?

উত্তর কলকাতার একটি নামী-দামী অঞ্চল, অধুনা অধিকতর দামী, দু দুটো বড় রাস্তার কর্ণার প্লটে যে বার্ষিক্যজীর্ণ শোভাসৌন্দর্যহীন একতলা বাড়িখানা তার পলস্তারা খসা সেকেলে আধলা ইঁটে গাঁথা দেহখানা নিয়ে, ততোধিক জীর্ণ—দীর্ঘ ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে অনেকখানি বেহিসাবি জমির বুকজুড়ে বোকার মতো ছমড়ে বসে আছে তার দিকে তাকালে কি পথচারীর দার্শনিক নিঃশ্বাস পড়ে ? পড়ে না। পড়বার কথাও নয় !

বাড়িটা তো বর্তমান মালিকের সীমাহীন নিবৃদ্ধিতার নিদর্শন। তাই পথচারী-দর্শক এই ভাড়া-ইঁটের পাচিল ঘেরা অনেকখানি গাছ-আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়ো পোড়ো জমির মাঝখানে বসে থাকা কুদর্শন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মালিকের মুখ্যমির সমালোচনা করতে করতে চলে যায়।

বছরের পর বছর কী লোকসানটাই খাচ্ছে লোকটা। অবশ্য সব লোক আবার চলেও যায় না—জমি কেনা বেচার দালালশ্রেণীর লোক তো সর্বত্রই ঘোরে, যেমন ঘোরে জীবন-বীমার দালালরা। তারা জানে তাদের নাছোড়বান্দা চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হবেই। এখানেও কিছু কিছু জমির দালাল তাই ভেবে শক্তি সটচাযির এই

মাটির মাটি নিয়েছিল, কিন্তু শক্তি ভটচাষিয়ার শক্তির কাছে তারা হার মেনে বিদায় নিয়েছে। তবে একেবারে কি বিদায় নিয়েছে? তারা আর না আশ্রুক তাদের স্বজাতির তো অভাব নেই? এখনো আসে দালাল-ঢালাল, এই জমিটার অর্ধাংশ বেচেও যে তিনি জীবনের হাল এবং বাড়ির ভোল ফিরিয়ে ফেলতে পারেন, তা বিশদ বোঝাবার জন্তে উঠে পড়ে লাগে, কিন্তু শেষ ফল একই।

প্রথমদিকে অনেকে ভাবতো লোকটা তার জ্ঞাতীদের মতো অল্প দাঁও মারার প্রলোভনে না ভুলে বেশী দাঁও মারার তালে আছে, এখন আর তা ভাবে না। শেষ পর্যন্ত ভাবে লোকটা পাগল। কিন্তু সেকথা শুধু কি স্বেয়োগ সন্ধানী দালালের দল অথবা জমি সন্ধানী ভদ্রলোকের দলরাই ভাবে? শক্তি ভটচাষিয়ার আত্মীয়স্বজন? জ্ঞাতি পরিজন? স্ত্রী পুত্র?

ভাববেই তো।

এই ভটচাষি বংশের অনেক ভটচাষি তো তাদের নিজ নিজ অংশের সোনারখনি তুল্য জমি বেচে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ চড়া দামে ঘরবাড়ি সমেত জমি বেচে দিয়ে অল্প পাড়ায় গিয়ে স্থখে বসতি করেছে। জ্ঞাতির আওতা ত্যাগ করে, কেউ কেউ বা কিছুটা রেখে কিছুটা বেচে, সেই টাকায় তিনচারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি বানিয়ে বাড়িওয়ালা বনে গিয়ে রাজার হালে আছে। আছে। কারণ তাদের বুদ্ধি আছে।

আর বুদ্ধিহীন শক্তি ভটচাষি? আর্যোবন যেন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে করেই চলেছেন। ঘরে বাইরে।

সুদূরে পাওয়া যায় একদা এই ভটচাষি বংশের এক পণ্ডিত পুরুষ (শক্তি ভটচাষিয়ার প্রপিতামহ না বৃদ্ধপ্রপিতামহ কে জানে) তারা ভটচাষি যখন ভাগ্যাহ্বেষণে নবদ্বীপ থেকে চলে এসে কলকাতায় এই অঞ্চলে ধুলোর দামে অনেক বিধে জম্মুলে জমি সংগ্রহ করে নিয়ে আর তার মাঝমধ্যখানে একখানা খড়ের চাল মাটির দেওয়ালের বাসা বানিয়ে ফেলে একটা টোল খুলে বসেছিলেন, তখন নাকি এখানের আশে পাশে বাঘ ডাকতো।

শহরের উন্নতি আর বিস্তৃতির চাপে, সেই বাঘেরা অবশ্য অচিরেই বাপ বাপ ডাক ছেড়ে গভীর গহনে পলায়ন করেছিল, কারণ শুধু যে বাঘই মানুষের ভীতিকর তা তো নয়, মানুষও বাঘদের কাছে যথেষ্ট ভীতিকর। সে যাক, বাঘেরা কিছদস্ত্রী রেখে চলে গেল। বন কেটে বসতির কাজ দ্রুত এগোতে লাগল, তারা ভটচাষিয়ার টোলরও বোলবালাও ঘটালো। মাটির বাড়ি ভেঙে দালান বাড়ি উঠল, 'ভটচাষিয়ার টোল' এ অঞ্চলে রাস্তার একটা নিশানা হয়ে পড়ল।

প্রথমদিকে পণ্ডিত সাহস করে স্ত্রী পুজকে নিয়ে আসতে পারেন নি, দেশের সংসারে গ্রামের সমাজে নিন্দে উঠবে বলে। কিন্তু ছোট ছোট বাড়ি অনেকগুলো বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। প্রধানত আশ্রিত প্রতিপাল্যদের জন্তেই অবশ্য টোলের ছাত্ররা, যারা দূর থেকে এসেছে শিক্ষার্থী হয়ে তারা কোথায় থাকতে যাবে পণ্ডিতমশাইয়ের আশ্রয়ে ছাড়া? ...দেশ থেকেও তো নিয়ে আসছেন হরদম! জ্ঞাতীদের ছেলে ভাগ্যে ভাইপো শালীপো শালাপো, পড়শীর আশ্রয়, আশ্রয়ীর আশ্রয় সবাইয়ের অব্যবহৃত দ্বার তারা ভট্টাচার্য্যর বাড়ি!

সবাই যে টোলে পড়তে এসেছে তাও নয়, নতুন কলকাতার অদৃশ্য হাতছানিতে সম্মোহিত উঠতি তরুণরা আর উত্তমী যুবকেরা ধরে পড়েছে, একটা মানুষের মতো মানুষকে। ...মানুষটাও সেই ধরে পড়ার মর্যাদা রেখেছেন, মুঠো মুঠো ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

ক্রমে নিজের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠল। তখন সাহসও বেড়েছে কিছু। মেয়ে ক'টাকে বিয়ে দিয়ে পরগোত্র করে ফেলে, ছেলেগুলোকে নিয়ে চলে এলেন তারা-ভূষণ নিজের কাছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সংখ্যায় তো নেহাৎ কম নয় তারা, চার মেয়ে ছয় ছেলে। অবশ্য তখন এটা ভয়ঙ্কর একটা সংখ্যা বলে গণ্য হতো না। তারাভূষণ নিজে তো তেরো ভাইবোনের একজন। সে যাক—শেষ মেয়েটাকে ছ বছরেই বিয়ে দিয়ে ফেলে তারাভূষণ যখন ছেলেদের নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, নেহাৎ ছেলেগুলোর ভাতজলের জন্তেই তাদের মাকেও কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। তখন সংসারের মহিলাকুল আড়ালে আবডালে ফৌস ফৌস করলেও পুরুষজনেদের কাছ থেকে খুব বেদী বাধা পেলেন না তিনি। তাছাড়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের কাছে অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত এই ছেলেকে বাপ দাদা, কাকা জ্যাঠারা একটু সম্মিহর চোখেই দেখতেন।

সেকালের হিসেবে—

প্রায় প্রৌঢ়া চল্লিশ বছরের স্বরধুনী দেবী পতিদেবতার এই সন্ধিবেচনায় অন্তরালে তাঁর পা পুজো করলেও, বাইরে অপছন্দ ভাব দেখিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, ‘পণ্ডিত মনিষ্টির ই কী উটকো খ্যায়াল! আমি এই বড় বয়েসে নাচতে নাচতে সেই মেলেচ্ছর দেশে ছুটব? জাত জন্ম থাকবে কিছু?’

কথাটা তারাভূষণের খুড়ির মুখ কহিত হয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। তারাভূষণ মনে মনে হেসে, মুখেবললেন, ‘তালে তো ছোট খুড়ি, ধরে নিতে হয় আমারও জাত পাত নেই।’

খুড়িই ষাঁট ষাঁট দিয়ে উত্তরটা দিলেন, ‘ও মা! ভাস্করপোর এক কতা! বেটাছেলের

হলগে, আড়াই পা বাড়ালেই শুকু। শাস্ত্রের যত বিদেন তো মেয়েছেলের জন্তেই।' বাড়ির মধ্যে সেজবোমাটিই হচ্ছে সবচেয়ে কাজের আবার সবচেয়ে জাহ্ননে শুকুনে ঘরের মেয়েও বটে, অত্যা আর বোরা তার কড়ে আঙুলের তুল্যও নয়। কাজেই খুড়ির আশা যদি সেজবোমার অনিচ্ছের খবর ভাস্বরপোকে এই অত্যায়ে ইচ্ছে থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

কিন্তু ভাস্বরপোর মধ্যে নিবৃত্ত হবার চিহ্ন ধরা পড়ল না। তিনি হাশ্ববদনে বললেন, 'কলকাতাটা যে "মেলেচ্ছ দেশ" এ খবর কে দিয়েছে খুড়ি তোমাদের বোকে? দেশটা কি অগঙ্গার? আমার ওখানের নিকট কাছেই তো বাগবাজারের ঘাট!'

অতএব খুড়ির আশা ফলবতী হলো না।

স্বরধুনী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে—পুঁটলি-পাটলা ঝাঁপি-চুপড়ি গুছিয়ে, ছয় ছেলেকে আঁচলে বেঁধে হনিমুনে যাত্রা করলেন।

পতির সঙ্গে পিতৃগৃহ থেকে প্রথম আসা, সেই যা একটুকরো রোমাঞ্চকর স্মৃতি ছিল জীবনে। অতঃপর তো আসা যাওয়া চলেছে ভায়ে ভাস্বরপো অথবা বাপভাইয়ের সঙ্গে। নবদ্বীপ থেকে পাটুলি, দূরত্বটাও তো ভীতিকর নয়। নৌকোয় চড়ে বসতেই যা দেবী।

স্বরধুনীর বিদায়কালে ঘাটে ভীড় জমল কম নয়, অন্তঃপুরিকারা কেঁদে ভাসালেন, স্বরধুনীও কেঁদে গঙ্গা বগয়ালেন বৈকি। সেটা কৃত্রিম নয়। চিরকালের শিকড় হেঁড়া! তারপর কলকাতায় এসে তাঁর অনভ্যস্ত নবজীবনের যাত্রা শুরু; সে তো আলাদা একটা ইতিহাস। দেশের বাড়িতে দায়িত্বের ভাগ নেবার লোক ছিল, এখানে সম্পূর্ণ একা। এবং দেখলেন কেবলমাত্র ছয়টি ছেলের জননীর ভূমিকা পালন করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবার প্রশ্ন ওঠে না। আশ্রমজননীর ভূমিকা নিতে হচ্ছে তাঁকে।

সেকালের মজবুত হাড়, আর মজবুত বনেদের শিক্ষা, স্বরধুনী দেবীকে এ গৌরবের ভূমিকায় সসম্মানেই উত্তীর্ণ করেছিল। তারাদুষণও নববলে বলীয়ান হয়ে টোল-বাড়ির এবং বিষয় সম্পত্তির উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু এসব তো আর ইতিহাসে স্বাক্ষর রাখার মতো ঘটনা নয়।

ছয় ছেলের নামে নামে ছটা আর মেয়েরা আসবে যাবে বলে তাদের নামকরে একটা এই সাত সাতখানা বাড়ি তিনি বানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে তো নিতান্তই বাড়ি মাত্র। নেহাৎই বাসগৃহ কাঠের গরাদে দেওয়া ছোট ছোট জানলাদার, লম্বা মানুষকে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়, এমন দরজা সম্বলিত একতলা। একতলা সেই দালান বাড়িগুলির না ছিল ছিরি না ছিল হাঁদ। রাস্তার পরিকল্পনাই বা কী? বিঘে

দশেক জমি ছিল দখলে, তারই মাঝখানে মাঝখানে এক একটা বসিয়ে দেওয়া । বাকি জমিতে টানা লম্বা গোয়ালের চালী, রাজমিস্ত্রীদের মালমশলার স্তূপ যেখানে সেখানে যাহোক গাছ । এই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে এইমাত্র । বৃক্ষরোপণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ।

কালক্রমে পটপরিবর্তন হতে থাকল দ্রুত, সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই অঞ্চল, একদা যেখানটায় মাত্র সাপ্তাহিক হাট বসতো, সেখানে—রীতিমত দৈনিক বাজার বসে গেছে । আর বর্তমানে তো দুবেলা সমান তালে । রাস্তা গড়ে উঠেছে বিশাল চওড়া চওড়া ।

তারা ভটচাষির ছয় ছেলের সম্ভান-সম্ভতিকুল যতদিন পেয়েছে পিতামহের আমলের সেই বাড়িতে বাস করেছে, তার পরের ইতিহাস তো আগেই বলা হয়েছে ।

শহরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে বেড়েছে এ অঞ্চলের নাম আর দাম । এবং বুদ্ধিমানেরা সেই নামদামের সুযোগ হাতছাড়া করে নি ।...

কীভাবে কলকাতার অনেক জায়গার মতোই বিঘের দামে কাঠা, আর সেই কাঠার দামেও ইঞ্চিখানেক জমি বিক্রী হয়েছে, তার উল্লেখ নিম্নয়োজন । শহরতলিতে এখনো তো চলছে সেই ঘটনা ।

ভটচাষিদের জমি সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছিল, যখন তার একটা পাশের রাস্তা দিয়ে বাসচলাচল করতে শুরু করল । আর অবিশ্রান্ত লাফ মারল, যখন সামনের রাস্তায় ট্রামলাইন পাতার তোড়জোড় দেখা গেল ।

অবশ্য সেও আজকের কথা নয় । তারপর অঞ্চলটার চেহারা আমূল বদলে গেছে । শুধু ভটচাষির টোলবাড়ির শেষ চিহ্ন বহন করে বোকার মতো বসে আছে কর্ণার প্রটের ওই পোডো জমি আর ভাঙা বাড়িটা ।

তারাতুণ্ণের বড়ছেলে ভক্তিভূষণ টোলটা চালিয়েছিল কোনোরকমে । ভক্তিভূষণের একমাত্র ছেলে শুদিক দিয়ে যায় নি । সে সায়েবের আপিসে চাকরী করেছে । এবং অতঃপর বংশের ধারাই পালটে গেছে । শক্তিভূষণও তো একটা সপ্তদাগরি অফিসে এক কলমে জীবন কাটিয়ে এখন রিটায়ার করে বসে আছেন ।

নামের ‘ভূষণ’ ধরে ধরেই যা বংশধারার গতিচিহ্ন । যে কোনো নামের শেষে যুক্ত থাকা চাই একটি ‘ভূষণ’ । তা সে তাতে মনে থাকুক না থাকুক ।

কিন্তু অঞ্চলটার নাম ? নামটা অল্পকাল থাকলে, ক্ষতি কী ? আচ্ছা না হয় ধরে নেওয়া যাক—‘টিয়া বাগান’ ।

কলকাতা শহরবাসীরা যে ‘বাগান’ শব্দটার প্রতি নিষ্ঠাস্থই অহরহ তা শহরের রাস্তার নামটামের দিকে লক্ষ্য পড়লেই তো বেশ ধরা পড়ে । না হলে—‘হাতী’

‘লিংহীর’ মতো ভয়াবহ জীব থেকে শুরু করে চোরকেও বাগানের বলয়ে আবদ্ধ রাখতে কল্লনা তৎপর হয়?’

আর ফলটলের কথা তো বাদই দাও। নামী ফলেরা তো আছেনই, কলা, পেয়ারা আতা, ফলসা, লেবু এরাও তো জাতে উঠেছে কলকাতার রসিক সমাজের কল্যাণে পাখী পক্ষীরাও ঢুকে পড়েছে বৈ কি সে দরবারে। টিয়াও ঢুকলো না হয়। অতএব টিয়াবাগান।

‘টিয়াবাগান বাজার’ এখন কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকটি বাজারের একটি। যেখানে শক্তি ভটচাষি একটু বেলার দিকে, ভীড়ভাট্টা কমলে, ফুটোয় কাগজ গৌজা ছেঁড়া চটের থলিটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার করেন। ছেলেরা বাজার করতে চায় না, মা বললে বলে, বাবার মনেরমতো বাজার করার উপযুক্ত এলেম আমাদের নেই ‘মাদার’। মাপ করো।

ছোটছেলে তৃপ্তিভূষণ, ডাকনাম যার তিপু, এবং ওই নামেই যে পাড়ায় বিখ্যাত, সে আবার মেজ দাদা দীপ্তিভূষণের থেকে এককাঠি বাড়িয়ে বলে, বাজার করতে গিয়ে যদি টু পাইস পকেটে না এলো, ফরনাথিং খেটে মরি কেন জননী? বাবা তো শেষ পাইটির অবধি হিসেব চাইবে।

কথাটা শেফালীকে আর কষ্ট করে স্বামীর কাছে পেশ করতে হয় না, আশপাশ থেকে কানে যায়ই শক্তি ভটচাষ্যের। তিনি কোনো মন্তব্য করেন না, রাগ বিরক্তির বোঝা যায় না। তালি মারা জুতোজোড়াটি পায়ে গলিয়ে নিজ সময়মত থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তালিহীন জুতো কবে পরেন শক্তি তা কারো মনে থাকে না।

বড়ছেলে শান্তি যখন চাকরীতে ঢুকেছিল, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই মায়ের জন্তে একটা কোরা লালপাড় শাড়ি, আর বাবার জন্তে পুরোপুরি একটা পোষাক সেটাই কিনে এনেছিল। একথানা ধোওয়া ধুতি, একটা টু ইন শার্ট, একটা গেঞ্জি এবং একজোড়া জুতো।

শক্তিভূষণ তখনো সার্ভিসে, তবে ছাড়ার সময় ঘনিয়ে আসবো আসবো। সওদাগরী অফিস বলেই গড়িমসি চলছে।

জুতো?

শক্তিভূষণ প্রথমেই জুতোটায় চোখ ফেলে মুহূ হেসে বলেছিলেন, ‘পয়লা রোজগারে’ বাপকে জুতো? তা ভালো।’

শেফালী রেগে উঠেছিলেন, এ আবার কী কথার ছিঁড়ি তোমার? জামা-কাপড় গেঞ্জি জুতো সবই তো এনেছে। আপিস যাবার একটা সেট।

শক্তিভূষণ আরো স্বল্প হাসি হেসেছিলেন, সেটাও তো একরকম জুতোই। অফিসের

খাতায় তো কালের ঘণ্টা বেজে এসেছে। এখন নতুন জুতো জামা? শান্তি ঘর থেকে উঠে গিয়েছিল।

শেফালী তীব্র হয়েছিলেন, ছেলেটা আহ্লাদ করে বাপের নাম করে উপহার আনলো আর তুমি এইরকম করলে? মনে একটু বাজলো না? আশ্চর্য! সামনের সোমবার থেকে পরবে এসব, বলে রাখছি।

শক্তিভূষণ বললেন, বললাম তো শেষ বাজারে জাঁক দেখাতে যাবার শখ নেই। পুরনোই চলুক এ কটা দিন।

ঠিক আছে বাড়িতেই পোরো। রিটার্নার করলেই তো আর তুমি গেকুয়া ধরবে না। কী ধরবো বলা যায় না। তবে জীবন কাটল ছ টাকা ন টাকার জুতো পরে, এখন আর মরণকালে ব্রিটিশ টাকার জুতো পরতে বাসনা নেই, শান্তিকে বোলে দিও দোকানে যদি দাম ফেরৎ না দেয়, বদলে গুর নিজেরই একজোড়া জুতো কিনে নেয় যেন।

ওকে তো তুমি চাকরীতে ইন্টারভিউ যেতে নতুন জুতো কিনে দিয়েছ। এক্ষুনি কো দরকার?

শক্তিভূষণ হেসে উঠেছিলেন, আরে ছি ছি। সে আবার জুতো! সাড়ে চোদ্দ টাকা দাম।

বড়ছেলের উপহার পর্ব সেইখানেই ইতি।

তারপর তো ইতিহাস অনেকটা গড়িয়ে গেছে।

বিবাহিত শান্তিভূষণ এখন স্ত্রী পুত্র নিয়ে আসানসোলে থাকে। রেলের চাকরী, বদলীর ঘটনা ঘটে মাঝে মাঝে। ছুটিছাটাতে কখনো রেলের পাশে ভ্রমণে যায়। কখনো বাড়ি আসে। এলে বৌ থাকতে যায় বাপের বাড়ি, শান্তি এখানে থাকে বটে, তবে অধিকাংশ দিনই ওবাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে। তাদেরও যে একটা মাত্র জামাই। সাধ আহ্লাদ থাকবে না?

শেফালী আক্ষেপের অভিযোগ তোলে, সারের সার বড় ছেলেটাকে তুমি ইচ্ছে করে পর করে দিলে।

‘পর’ কেউ কাউকে করে দিতে পারে না। সে যাক ‘সারের সার’ কেন? স্মৃষ্ণেতে মাইনেতে অনেক টাকা উপায় করে বলে?

ঘুষ? ঘুষ নেয় শান্তি?

মাইনের বহর জানলে, আর আচার আচরণ দেখলে সেই সন্দেহই মনে আসে আর কি। তা তোমার আক্ষেপ কিসে? তোমার কাছ থেকে তো ‘পর’ হয়ে যায় নি?

তোমায় তো যখন তখনে বোয়ের হাত দিয়ে ভালো ভালো জরিটরিদার শাড়ি প্রণামী দেয় ।

তোমার সব কথাই ঝাঁক । বোয়ের হাত দিয়ে আবার কী ! বোমা মেয়েছেলে, শাড়িটাড়ি বোঝে ভালো, নিজে দোকান বাজার যায়, পছন্দ করে কেনে, হাতে করে আনে । এতে দোষটা কী হলো ?

নাঃ দোষের আর কী ?

বলে শক্তিভূষণ হয়তো শাবলখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামেন মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে । বাড়ির আশেপাশের জমিটা এখন বেশ কিছু কাজে লাগিয়েছেন শক্তিভূষণ । যে সব স্থায়ী গাছগুলো ছিল, যেমন দু' একটা কুল গাছ পেয়ারা গাছ গোঁড়া লেবুর গাছ নিম্বলা একটা স্থপুরি গাছ আর ফলশূ নারকেল গাছ তাদেরই ধারে কাছে, শাক বোনের শক্তিভূষণ, নটে পালং । এদিকে ওদিকে পোঁতেন লাউ, কুমড়ো, কাঁকড়, উচ্ছে, ধাঁম, কাঁচালঙ্কার গাছ ।

রিচার্ডার করার পর প্রথম খুব উৎসাহ করে বলেছিলেন সবাই মিলে হাত লাগালে এই জমিটাকেই কীচেন গার্ডেন বানিয়ে ফেলে, আমাদের সম্বৎসরের তরকারি চচ্চড়ির ভাবনা মেটানো যায় । কী বলিস রে ? আলু বাদে কী না ফলানো যায়, বল ? চাকুরে বড় ছেলেকে বলেন নি, বলেছিলেন স্কুল ছাত্র মেজ ছোট ছেলে, আর অবিস্মৃতিতে মেজ সেজ ছোট তিন মেয়েকে । বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন নিজে চাকরিতে থাকতে থাকতেই ।

কিন্তু প্রস্তাবে খুব উৎসাহ দেখালেও, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল হাত লাগাতে কোনো হাতই বড় এগিয়ে আসছে না । মেজ মেয়ে বিভা বলল, সামনের দিকটায় ফুল বাগান করা হোক না বাবা । আমি আলাদা করে যত্ন করবো ।

ওই পর্যন্তই ।

কারণ তার মেজদাদা দীপ্তিভূষণ সেই মুখ ঝাঁকিয়ে বলল, এই খেঁদো পাঁচিল, আর এই পচা বাড়ির সামনে ফুল বাগান !

সেই মন ঘুরে গেল বিভার ।

সত্যি কী শ্রীহীন নিলজ্জ নিরাবরণ দৈন্যের সাক্ষ্যবাহী তাদের এই বাড়িটা ! ইস্কুলের বন্ধুরা এসে ঢুকলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ।

তার। হয়তো কখনো বলে, তাদের বাড়িতে কতগুলো ঘর রে বাবা ! কত দালান রোয়াক প্যাসেজ । মাথা গুলিয়ে যায় ।

কিন্তু সেই বলার মধ্যে স্তব্ধতা পাবার কিছু নেই ।

একগাদা ঘরই আছে । সাজানো গোছানো আছে ?

কলকাতা শহরে, এই টিয়াবাগানের মতো পাড়ায় কেউ কল্পনা করতে পারে এক এক থানা বড় বড় ঘর পড়ে আছে সাবেক কালের ভাঙা চোরা বড় বড় তক্তাপোষ, বেঞ্চ সেন্কে ভর্তি হয়ে, ভর্তি হয়ে জালানি কাঠ ঘুঁটে নারকেল পাতা, শুকনো ভাল-পালায় ।

রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটা তো শুধু শুধুই পড়ে আছে ।

একদা গুর নাম ছিল নাকি ‘কুটনোর ঘর ।’

কারণ ভট্টাচার্য বংশধরেরা আলাদা আলাদা বাড়িতে বসবাস করলেও, রান্না খাওয়ার মূল কেন্দ্র ছিল এই টোল বাড়িটা । এখানের মতো বিরাট দরদালান ছ’-সাতটা বাড়ির আর কোনোটাও ছিল না । এটাই পড়েছে শক্তিভূষণের ভাগে ।

আব যেটাকে বলা হয় ভাঁড়ার ঘর ।

মেটা দেখলে তো বিভার প্রাণ হাঁপিয়ে আসে ।

‘উঁচু নাড়া’ না কি তার উপর ঝুল ধুলোয় ভতি কত কত ইয়া ইয়া হাঁড়ি কলসী সাজানো । মাটিতে ঈটের থাক সাজিয়ে কতগুলো বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ছাতাপড়া জালা বারকোষ বৃহৎ বৃহৎ বঁটি কুরুনী । বিরাট বিরাট দুটো কড়া ছিল, তাইতে না কি মায়ের দিদি শান্তুডী রান্না করতে আর দুধ জাল দিতে । সেই কড়া দুটো তবু মা কাজে লাগিয়েছে শাবান কাচবার সময় কাপড় সেদ্ধ করতে, আর মাড় লাগাতে । বাড়িতেই তো সব করে নেয় মা । ঠিকে ঝাঁটা আলাদা পয়সা নিয়ে কেচে দিবে যায়, এই পয়স্তু ।

কিন্তু ওই ভাঁড়ার ? এই সব অবাস্তুর জঞ্জালে ভতি ঘর দালানগুলো ? বিভার সমস্ত কোটা কিশোরী মনকে যেন জাঁতায় পিষে মারে । মাঝে মাঝে মাকে বলে সে— এই সমস্ত জঞ্জাল একধার থেকে রাস্তায় ফেলে দিতে পার না মা ? ওই সব হাঁড়ি-কলসী জালা ড্রাম টিন, কাঠের থালা, মাহুষ কাটতে পারা যাবার মতো বঁটি, নাড়াতে পারা যায় না এমন শিলনোড়া—

শেফালী বেজার মুখে বলেন, ওই মাল রাস্তায় ? ফেলতে গেলে রাস্তা নোংরা করছ করছ বলে পুলিশে ধরবে ।

আহা । মজুর ডেকে জঞ্জাল মাফ করে না লোকে ?

তা হলে বলগে তোদের ওপরওলাকে । তার মা ঠাকুমার হাতের সাজানো সংসারকে জঞ্জাল বলে মজুর ডেকে পয়সা খরচ করে ফেলে দেবার পরামর্শ দিগে ।

সাজানো ! আহা কী সাজানো । ভেবে ঠিক করতে পারা যায় না এতো মোটা রুচি হয় কী করে মাহুষের ।

একথা অবশ্য বলতে পারে বিভা ।

কারণ তার জীবনে সে কখনো তেমন বৃহৎ সংসার দেখে নি যেখানে এই মোটা রুটির জিনিসগুলোই অপরিহার্য। তার দেখার জগতে তো ভাঁড়ার মানে সাপ্তাহিক রেশন ? আর নেহাৎ ফুরিয়ে গেলে তবে এক কিলো আধ কিলো করে আনা তেল দালদা, ডাল গুড়। আর পানের খিলির সাইজের কাগজের মোড়কে মৌরী পাঁচ ফোড়ন জিরে সর্ষে।

উচুতে তোলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি কলসীর গায়ে যদি বাটা হলুদে আঙুল চুবিয়ে লেখা থাকে ‘মরিচ’, ‘জিরে’, ‘সরষে’, ‘মৌরী’, ‘মেথি’, তাহলে গা কেমন করবে না এদের ?

এই সব মালকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তুলে রাখতে হবে। অসহ্য।

কিন্তু উপায় কী ?

বহুবিধ অসহকে সহ করে এই ভাঙা ইটের পরিমণ্ডলে পড়ে থেকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে ভটচামিয়া বাড়ির কটা উঠতি বয়েসের ছেলে মেয়েকে।

সব থেকে অসহ্য এই যে, নিরুপায় নয়, তবু নিরুপায়ের ভূমিকা।

বাড়ির বড়ছেলেটা একদা উঠতি বয়েস হতে না হতেই মনে মনে যে স্বন্দর ছিমছাম আধুনিক বাড়িখানির স্বপ্ন দেখেছে, একটা খাতা বেঁধে তাতে তার প্ল্যান এবং বহির্দৃষ্টি এঁকে এঁকে পাতা বোঝাই করেছে। সে বাড়ির কোন্ ঘরটা কার হবে, আর সে সব ঘর কী দিয়ে সাজানো হবে তা পর্যন্ত তার খাতায় মজুত।

আবার অন্ধ কষে কষে দেখেও রেখেছে, এই কুদর্শন বাড়িটা উড়িয়ে দিয়ে জমিটার বারো আনা অংশ বেচে ফেলে, বাকী চার আনার মধ্যে ওই বাড়িটা বানিয়ে ফেলেও কত টাকা হাতে মজুত থাকে। ...সেই মজুত টাকা দিয়ে সে যখন মনে মনে একটা ফ্রীজ কিনে ফেলে কলকাতায় সত্তা আগত টি ভির ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছে, তখন মন গেল ঘুরে।

এবং তার পরই, চেষ্টা করে কবে বদলী হয়ে বউ আর সন্তোজাত পুত্রকে নিয়ে কলকাতা ছাড়ল। তার মানে পরিকল্পনাও ছাড়ল।

কী করবে, যদি বাড়ি সম্পত্তির মালিক বলে বসেন, ‘আমার বাপ ঠাকুরদার জিনিস নিয়ে তোমাদের এতো মাথা ব্যথা কেন বাবা ? যতদিন না মরছি আমায় একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দাও—’ তা হলে আর কে সেখানে তিষ্ঠোতে চায় ? মান সম্মান-বোধ কার নেই ?

তার বউও তো জানাচ্ছে সে প্রতিক্রিয়া অপমানের মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু যার যাই হোক, শেফালীর মতো যজ্ঞা আর কার ? যে শেফালীকে আজীবন একটা ভেঙে যাওয়া বৃহৎ জাহাজের টুকরো টুকরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে গুছিয়ে সংসার

করতে হয়েছে হচ্ছে ।

শেফালী জীবনে কখনো তার নিজস্ব সংসারের জন্তে দুটো-একটা ছোটোখাটো হালকা বাসন কিনতে পায় নি । শেফালীর সংসারে স্টেনলেশন্টালের পদার্পণ ঘটে নি এখনো ।

কখনো কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শক্তি ভটচাষি ভুরু কুঁচকে বলেছেন, বাসন, কেনে সিন্দুরেরও বাসন কি সব চুরি গেছে ?

শুধু শথের জন্তে ? আশ্চর্য ! এই সব ভারী ভারী কাঁসা পেতলের বাসন তো সংসারের একটা সম্পত্তি একটা ঐশ্বর্য কটা বাড়িতে আছে ?

শেফালীর হাত-পা বাঁধা, শেফালী পড়ে মার খায়, কিন্তু মুখ বুজে অবশ্যই নয় । শেফালীর মুখে মুখে জবাব সাজানো শেফালী বলে উঠেছে—

ছিল সকল বাড়িতেই । ভিথিরির ঘর ছাড়া পুরনো মাল আর কোন গেরস্তবাড়িতে না থেকেছে । এখনকার কালে কে আবার সেই ভারী বোঝা টেনে মরে ? সেকালের মতন গতরই বা কার আছে ? সবাই সাবেকী বাসন বেচে বেচে, আজকালকার মতন কিনে কেটে নিয়েছে । চোখের সামনেই তো দেখলাম বসে বসে ।

তা দেখেছে বইকি শেফালী । তার চোখের সামনে দিয়েই তো ভটচাষি বংশের তোলা বদলালো । প্রথমে ভিতরে ভিতরে, তারপর আমূল । কত বাসনগুলোই জ্ঞাতীদের বাড়িতে আসতে দেখেছে সে । পুরুষরা তার সমর্থক ।

অথচ শেফালী চিরবঞ্চিত ।

পৃথিবীর কোনো লোভনীয় বস্তুর দিকে চোখ তুলে চাইবারও অধিকার নেই তার । কারণ তার স্বামীর রোজগার কম, তারা গরীব । সেই গরীবিয়ানা দিনে দিনে আরো বেড়েই চলেছে । চলবেই, কারণ বাজার দরও তো বেড়েই চলেছে । আর সেই স্বল্প রোজগারও এখন শূন্যের অঙ্কে ।

কিন্তু কেন ?

কেন শেফালী এমন চিরবঞ্চিতের ভূমিকায় পড়ে আছে ?

ভাগ্য ?

নাঃ । ভাগ্য কখনোই নয় । শুধু একটা নিষ্ঠুর আত্মসর্বস্ব জেদি একগুঁয়ে লোকের খেয়াল ।

ছেলেরা দিন গুনছে কবে তারা ‘দিন’ পাবে !

মেয়েরা দিন গুনছে কবে তারা ‘দিন’ পাবে !

কিন্তু শেফালী কিসের দিন গুনবে ?

শেফালী লোড্ শেডিং হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় কেরোসিনের কুপী জেলে রাঁধতে রাঁধতে

প্রতীক্ষা করে রাত কেটে যাওয়া পরদিনের । অন্ধকারে সব এলোমেলা করে রাখতে হয় । সকালের আলো ফুটলে আবার সব গোছানো যাবে ।

শেফালীর কাছে সেটাই দিন ।

এবেলার জন্তে ওবেলা, সকালের জন্তে রাত্রে আর রাত্রে জন্তে সকালে গুছিয়ে রাখা, এইটাই তো শেফালীর জীবন । আর কোন জীবনের সন্ধান সে পেয়েছে ?

লোড্ শেডিং তার বড় অস্ববিধে ঘটায় ।

কাজের চাকার ছন্দ ভঙ্গ হয়ে যায় মাঝে মাঝে ।

আবার ওই লোড্ শেডিং এ বাড়ির কারো কারো স্ববিধেও ঘটায় বই কি । এই যে তিপু এমন রাত করে বাড়ি ফিরছে, এটা তো লোড্ শেডিং বলেই কারো চোখে পড়বে না । অন্ধকারে টুক করে ঢুকে পড়বে । বাড়ির ঘেরা প্রাচীর । যাকে ঘোরালো করে ‘বাউগারি ওয়াল’ বলা যায়, তার সামনের দিকে সাবেকি কালের একটা ‘লোহা-কাঠের’ দরজা আছে বটে, যা নাকি শতবর্ষের রোদ জলেও এখনো টিকে আছে, সেটাই তো কখনো খিল পড়ে না । খোলাই পড়ে থাকে । বড়জোর ভেজানো । খিল দেওয়া তো হাস্যকর । পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় ইট খসে খসে এত ফোকর যে, অনায়াসে তার মধ্যে দিয়েই মানুষ গরু ছাগল পাগল সবাই ঢুকে আসতে পারে । চোরের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল । এ বাড়ির চেহারা দেখলে চোরেরও খাটতে ইচ্ছে করবে না । দরজাও তাই বন্ধ হয় না ।

অতএব তিপু যথারীতি বেড়িয়ে ফিরে গুর নিজস্ব ফোকরটা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল । থাক, অন্ধকারে ডিঙোতে গিয়ে কাজ নেই । যদি হোচট খায় । একবার অন্ধকারে বুড়ো আঙুলে বড় চোট লেগেছিল ।

কিন্তু দরজা ঠেলতে গিয়ে অবাক হলো তিপু ।

বন্ধ করল কে ?

এই দরজাটা নিয়ে মাথাব্যথা পড়ল কার ?

ওঃ । বাবা গেছে । বাবা !

তিপু কখন বাড়ি ফিরল তার হিসেব রাখার নতুন কৌশল । প্রথম প্রথম যখন তিপু বিকেলে খেলতে বেরিয়ে তনুদের বাড়ি গিয়ে ওদের আড্ডায় জমে গিয়ে দেরি করে ফিরতো, বাবা এই দরজাটার বাইরে বেরিয়ে এসে পায়চারি করতো । বলতো না কিছু, কিন্তু সেটাই তো আরো দুঃসহ । অতঃপর তিপু বলেছে সে তনুর সঙ্গে এক-সঙ্গে পড়তে যায়, তখন বাবা সে পদ্ধতিটা ছেড়েছে । যদিও একবার স্বগতোক্তি করেছিল, ‘বড়লোকের বাড়ি ঘন ঘন যাবার দরকার কী বুঝি না !’

স্বগতোক্তির জবাব দেওয়া চলে না, তাই তিপু মাঝে উদ্দেশ্য করে জোর জোর গলায়

বলেছিল, ওরা তো আমাদের আপনার লোক । ওখানে যেতে কী ? কত ভালবাসে সবাই আমাকে । তবু মা তো কত দুঃখ করে বলেন, তোমার মায়ের কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয় তিপু । আমাদের তো দু' ভাইয়ের ভাগ ছিল, তোমার বাবা তো এক ছেলে । বরং নিজের ভাই বোন বলতে কেউ নেই । ইচ্ছে করলেই কত ভালো ভাবে থাকতে পারতেন ।

শেকালী তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে বলে, চুপ বাবা, চুপ কর । ওই মাস্তুরের কানে গেলে এখন অপমানে থান থান হবে ।

তিপু যে তার কানে যাওয়াবার জন্তেই বলছে, তা কি আর মা বোঝে না ? তবু এও বোঝে মা ভয় পায় । তা ছাড়া অচরা মাকে মায়া মমতা করছে এটাও মা পছন্দ করে না সে কথা ছেলেবেলা থেকেই বোঝে তিপু । মা নিজে রাগ করে চোঁচায় ‘যেদিকে দু’ চোখ যাবে, চলে যাবো—’ বলে বাবাকে শাসায়, কিন্তু আর কেউ বললে চটে যায় ।

যাক—

বাবার তা হলে এ এক নতুন চাল ।

ঠিক আছে ।

সমস্ত রাত বাড়ি পাহারা দিক বাবা, তিপু নিজ অভ্যস্ত পথে ঢুকে পড়ে সোজা মায়ের কাছে রান্নাঘরে গিয়ে, ‘ভীষণ খিদে’ বলে খেতে বসে যাবে । যদিও ভীষণ খিদে প্রমাণ দেওয়া শক্ত । তবু মা যা জোর করে ভালো ভালো সব খাইয়ে দেন । ওদের বাড়ি রোজই ভালো ভালো খাবার । এতো সব রান্না জানেনও । তা সে সবও তবুদের অরুচি । খেতে বললেই ‘বাপরে মারে’ করে । তিপু খেতে পারে, খেয়ে খুশী হয়, এটা তবু মার খুব ভালো লাগে ।

কী সুন্দর দেখতে তবু মা ।

কী সুন্দর সাজানো গোছানো ওদের বাড়িটা । দেখলে আনন্দ আসে । আর তবুর ছোট বোনটা, মিছ । কেমন চালাক চতুর হাসি খুশী । ওর সঙ্গে তবুরা (তবু আর তার দাদা কিছ) খেলে না বলে তিপুকে ধরে পড়ে ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্তে । আর কেবল বলে, তোমাদের বাড়ির ওখানে কত খালি মাঠ, কী দুর্দান্ত ব্যাডমিণ্টন কোর্ট বানানো যায়, অথচ কেমন-যে করে রেখেছ ।

কেমন যে করে রেখেছে সে কথা তিপু তো হাড়ে হাড়েই জানে । বারো মাসই তিপুদের বাড়িতে নানান জিনিসে উই ধরে, কত সব জিনিস ইঁদুরে কাটে আর-শোলায় কুঁচোয়, সেই সব টেনে এনে এনে খোলা জমিতে রোদে দেওয়া হয় । বাড়ির পিছন দিকটায় যে জায়গা আছে, সেদিকে নাকি বেশি রোদ যায় না । তা

ছাড়া সেখানে তো জায়গা জুড়ে বানিয়ে রাখা হয়েছে চাপড়া চাপড়া ঘুঁটে, গোন্ধা গোন্ধা কয়লা গুড়োর গুল।

অতএব ‘সদর দরজার’ ভেজানো কপাট ঠেলে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে হেঁড়া চট্ট ইঁদুরে কাটা বিছানা বালিশ, উই ধরা মাদুর শতরঞ্চি। অথচ এর সামনেই বাবার পরম ভক্তির ‘মন্দিরটি’। চানটান না করে বাবা ছোঁয় না ওই মন্দির। মাও তাই করে বোধহয়। জানে না তিপু।

আবার— ভেবে মনে মনে হাসে তিপু, বাবা জানে না, তিপু যখন পাঁচিলের ভাঙা পথ দিয়ে ঢোকে, ওই মন্দিরটাকেই আগে ছোঁয় হাত বাড়িয়ে। ইচ্ছে করেই ছোঁয়া, কাছেই পড়ে তো? দরজা থেকে একটু দূর।

এখনও তাই করল তিপু।

ভাঙা হলেও একালের মতো সীমেন্ট গাঁথুনি পাঁচ ইঞ্চির দেয়াল তো নয়। মাটির গাঁথুনি, ইটের-চাপান। সেকালের কাজ, ধারে না কাটুকে, ভারে কাটতো। খুঁড়তে খুঁড়তে শ দুই বছর লেগেছে।

সেই ইটের চাপান চওড়াটা ডিঙিয়ে আসতে পরিশ্রমমন্দ হয় না, তবু এটা একটা আমোদ তিপু। অথবা হয়তো গতানুগতিক পথটাকে পরিত্যাগ করবার মনোভঙ্গীর একটু সূচনা।

এদিকে চলে এসে এবড়ো খেবড়ো জমি ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসতে গিয়ে আর একবার থমকতে হলো তিপুকে। ও কী? ওরা কে? বাবার সাধের লাউমাচার নীচে?

সাধেরই বলতে হয়, কেউ তো সাহায্য করতে আসে না, পাছে বাবা ভাকে এই ভয়ে বাবাকে তোড়জোড় করে উঠানে নামতে দেখলেই কেটে পড়ে সবাই। বাবা একাই বাশ কেটে দড়ি বেধে বানিয়েছে ওটা। ভাকেওনি কাউকে! দারুণ মানী তো! মানীদের ভাগ্যে যা হয়, তাই হয়েছে বাবার, একা হয়ে বসে আছে।

তা যাই হোক, বানিয়েছে তো ভালই। লাউরা যাতে ওর ওপরে ভালপাল। মেলে গা গড়িয়ে গড়াগড়ি দিতে পারে তেমন মজবুতও করেছে, তাই বলে ওটা কি বাস স্ট্যাণ্ডের শেড? তাই দু’ দুটো মানুষ ওর নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?

শুধু দাঁড়িয়ে আছে বা বলা যায় কী করে? নড়ছে চড়ছে, হাত মুখ নাড়ছে। জ্যোৎস্না না থাক আকাশের একটা আলো থাকে, যেটা শুধু লোভ-শেজি-এর সময়ই বুঝতে পারা যায়।

তিপু নিখর!

তিপু নিষ্পন্দ!

তিপুর বয়েস চৌদ্দ ছুঁয়েছে। তিপু তাই দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু আর নাড়ের সমস্ত সূক্ষ্ম টিস্তুলিকে পর্যন্ত একাগ্র করে শুধু চোখের তারা ছটোর মধ্যে সংহত করে দেখতে চেষ্টা করছে ওদের মুখ দুটো কাছাকাছি চলে আসছে কিনা। খুব কাছাকাছি।

কিন্তু তিপু কি শুধু দেখছেই? না প্রতীক্ষা করছে? প্রতীক্ষাই বলতে হয়। তিপু সর্বাস্তঃকরণে প্রার্থনা করতে থাকে জীবনে একবার অন্তত সে একটা ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চময় অবৈধ দৃশ্যের দর্শক হোক।

দেখতে দেখতে স্বপ্ন আলোকও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিপু এখন দেখতে পাচ্ছে ওই দুটো মানুষের মধ্যে একটা হচ্ছে মেজদি, আর অন্যটা হচ্ছে রেডিওর দোকানের সেই ছেলোট।।...তু। তিপু অস্বাভাবিক তা হলে কারেক্ট। তিপু সন্দেহ অপ্রাসঙ্গিক। কিছুদিন থেকেই মেজদির অকারণ রেডিওর দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করা দেখেই তিপু সন্দেহ হয়েছিল। কলেজ যেতে, কলেজ থেকে আসতে, কোনো-না-কোনো সময় চোখে পড়েই যায় তিপু।

আর মেজদি ওকে হঠাৎ দেখতে পেলেই বাচ্চার মতো আহ্লাদে ভাষা মুখে বলে ওঠে, দোকানটা আজকাল কা অর্পূর্ব সাজিয়েছে দেখেছিস রে তিপু!

যেন তিপু একটা বাচ্চা, কিছু বোঝে না।

বোঝবার বয়েস হয়েছে কি না জানে না, কিন্তু তিপু যে বোঝে অনেক কিছু তা সে নিজেই টের পায়। স্কুলের বন্ধুরা অবশ্য বলে, 'এটা একটা গ্যাকা থোকা।' সেটা তিপু চালাকি। তিপু ওদের বদমাইসি বদমাইসি পাকা পাকা কথা সব বুঝতে পারে, তবু অবোধের মতন তাকিয়ে থাকে। কী দরকার বাবা নিজেকে প্রকাশ করবার? একবার প্রকাশ হয়ে গেলেই ওদের দলে মিশে যেতে হবে। সেটা চায় না তিপু।

তিপু ওদের মনে মনে ঘেন্না করে।

'নর্থ টাউন হাইস্কুলটা' আবার একটাই স্কুল! বাজে! বাবা বলে স্কুলের আবার ভালো মন্দ কী, ছাত্র ভালো হওয়া নিয়ে কথা। এই স্কুলে পড়েই কত কত লোক বড় হয়েছেন। আমরাও তো এইখানেই পড়ে মানুষ হয়েছি। কত দিনের পুরনো স্কুল। এতিমই আলাদা।

তিপু তা মানে না।

তহুর স্কুলটা কী ভালো।

তহু তিপু আদর্শ।

যদিও তিপু জানে সে তহুর থেকে অনেক পাকাচোকা ছেলে।

তহু হলে কি এই পরিস্থিতিতে এ রকম অধীর আগ্রহে মাথার চুল খাড়া করে

প্রতীক্ষা করতে থাকতো একটা রোমাঞ্চময় দৃশ্যের আশায় ?

কিন্তু তিপু প্রতীক্ষা সার্থক হলো না ।

তার মানে ‘সে সব’ তিপু আসার আগেই সারা হয়ে গেছে । তিপু দেখল মাচার নীচে থেকে মাথাটা নীচু করে বেরিয়ে এলো দোকানী সমীর । বেজায় লম্বা তো । এতোক্ষণ ঘাড় মাথা নীচু করেই ছিল তা হলে । বেরিয়ে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে একটু হাসির সঙ্গে বলল, ‘তা হলে ওই কথাই রইল ।’

তারপর অন্ধকারে এবড়ো খেবড়ো মাটিতে প্রায় হোঁচট খেতে খেতে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেল । দরজার খিলটা খুলল, বেরিয়ে গিয়ে টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল ।

আর খিল পড়বে না, এটা বুঝে গেছে তিপু । কিন্তু মেজদি মাচার নীচে থেকে বেরোচ্ছে না কেন ? কী করছে ওখানে ? কিছু নিয়ে নাড়ানাড়ি করছে যেন । নির্ধাৎ ভেঙেছে মাচাটা ।

যা লম্বা লোকটা, মাথার ধাক্কা খেয়েই হয়তো—আচ্ছা তিপু যদি এখন চেষ্টা করে ওঠে, ‘মেজদি, ওখানে কী করছিস ?’ বলে ।

নাঃ চেষ্টা করে ওঠাটা বোধহয় সেক হবে না ।

আস্তে আস্তে গিয়ে যদি—

এ কী ! অ্যা !

মেজদির ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল কোথা থেকে তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো । দু সেকেন্ডও ভাবতে হলো না, কোথা থেকে এলো বোকাই গেল আলো ফ্লেপণের সঙ্গে সঙ্গেই যে স্বাক্ষর করা হয়েছে, কে ওখানে !

চিরভয়ঙ্কর, চির বিরক্তিকর সেই গলা । গম্ভীর ধাতব ভারী ।

আবার হঠাৎ তিপু অবিশ্বাস্যভাবে নিজের গলাটা শুনতে পেল । তিপু জানে না সে কখন কথা কয়ে উঠল, কিন্তু পেল শুনতে, আমি ! তিপু !

তিপু ! তুমি ওখানে কী করছো ?

কিছু না ! এমনি ! অন্ধকারে আসতে আসতে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে—বোধহয় তোমার এই সব লাউটাউ পড়ে গেছে । তুলতে পারছি না ।

যা পড়ে গেছে থাক—

টর্চ হাতে বেরিয়ে এলো বাবা, বলল, রাজ্রে গাছে হাত দেওয়া নিষিদ্ধ, চলে এলো ।

আর কী করবে তিপু ? আর কী করতে পারে ? চলে এলো । শক্তি ভটচায় আর কোনো প্রশ্ন করলেন না । বললেন না, এতো রাস্তিই কিরলে তা হলে ?

এইতই আরো বাবার ওপর রাগ আসে তিপু । কেন, জিগ্যাস করলে কী হয় ?

সেটা করলে তো কৈফিয়ত দেবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। বলতে পারা যায়, সামনে পরীক্ষা, এখন পড়া-টড়া বেশী।

তবু কথা চালাবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করতে তিপু বাবার পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলে, এমন বিচ্ছিরি করলাম। খুব বোধহয় ভেঙে গেছে।

ভেবেছিল বাবা বোধহয় উত্তর দেবে না।

সেই রকমই তো অহঙ্কার মহাশয় ব্যক্তিটির। কেউ কথা বললে যে তার একটা উত্তর দেওয়া সভ্য রীতি, এটা উনি আদৌ মানেন না। ইচ্ছে হলে জান, ইচ্ছে না হলে জান না। কিসের যে এতো অহঙ্কার তা জানে না তিপু।

অহঙ্কার করবার আছে কী?

মনে মনে ভাবতে পারো বটে তুমি তিন চার লাখ টাকার মালিক, কিন্তু তাতে লাভটা কী? লাভটা কী? অবস্থা তো এই। একটা হেঁড়া ধুতি, আর একটা ফুটো গেঞ্জি, এই তো সর্বদাব মাজ। খাচ্ছো যা, তাও তো এক্ষুনি গিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে।

ইয়া বড ইয়া ভারী একথানা কাঁসা না কিসের যেন থালায় মোটা মোটা কটা রুটি, আব খানিকটা ল্যাবডা তরকারি। বাটিতে কী? না, একটু ডাল। মাছ নয়, মাংস নয়, দুধ নয়। ভালো ভালো তরকারি নয়, মস্ত একটা বাটিতে একটু খালি ডাল।

মা যখন এক এক সময় রাগ করে বলে, কিসের জন্তে যে এই বড বড থালা বাসন টেনে মরি। রান্নার ছিরি তো এই। সকালে কর্তারা সাত ব্যঞ্জন মাজিয়ে ভাত খেতেন, মানাতো এ থালা।

সে সময় বাবা কথার উত্তর দেয়। বলে, বেমানান মনে হয় তুলে রেখো ওগুলো। বাজার থেকে মাটির খুরি আর শালপাতা এনে দেবো।

মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলে, তাতে তোমার অনর্থক বাজে খরচ হবে না?

বাবা অনায়াসে বলে, তেমনি বাসন মাজা লোকের খরচটা তো বেঁচে যাবে।

বেঁচে যাবে। ওঃ স্বথদাকে ছাড়িয়ে দেবে?

বাঃ! বাপনই যদি না থাকলো, বাসন মাজা লোকের দরকারটা কী? পাতা খুরি তো নিজেরাই ফেলে দেওয়া যায়।

মা সহ করে চলে সব, কিন্তু চোঁচাতে ছাড়ে না। একথা শুনে মায়ের গলার শব্দ আকাশে ওঠে, ওঃ! শুধু পাতা ফেললেই হবে আর কোনো কাজ নেই সংসারে?

বাবা আরো অবলীলায় আর আরো ধাতব গলায় উত্তর দেয়, তার জন্তে তো সংসারের লোকের ভগবানের দেওয়া হাত-পাগুলোও আছে। তখন তো আবার তা হলে সেগুলো অকেজো হয়ে গিয়ে অনর্থক বেমানান লাগতে পারে।

মা প্রায় ধেই ধেই করে নেচে উঠে বলে, শুনলি ? শুনলি তোরা ? ঝাখ্ এবার কী
মাছুষ নিয়ে ঘর করে এলাম আমি ।

মায়ের চুলের গিঁঠ খুলে যায়, গায়ের আঁচল লুটিয়ে যায়, চোখে আগুন ঠিকরায় ।
তবু আবার পরদিন দেখতে পাওয়া যায় সারি সারি ভারী ভারী পীড়ি পেতে,
আর বড় বড় থালা সাজিয়ে সবাইকে খেতে দিচ্ছে মা । পাতের পাশে ছুন লেবুটিও
দিতে ভোলে নি । লেবুগুলো বাড়ির গাছের তাই । কিনে খেতে হলে নিশ্চয়ই এ
ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারতো না মা ।

এই তো ক্যাপাসিটি, শ্রীশক্তিভূষণ ভট্টাচার্যের ।

তবু কিসের এতো অহমিকা !

যখন হেঁড়া চটের থলি হাতে বাজার নিয়ে আসে, তখনও মুখের ভাব দেখো । যেন
পৃথিবীটা গুঁর নশ্টি । উনি যেন কোন উচ্চলোকের জীব ।

এসব কথা মনে উদয় হয়, আর বাবার ওপর রাগ বেড়ে যায় তিপুর । কিন্তু এখনো
তিপু মেজদার মতো বাবাকে তাচ্ছিল্য দেখাতে অভ্যস্ত হয় নি । ওই আর একটি ।
মেজদা ।

বাবার কার্বন কপি ।

এরও যেন সারা শরীর দিয়ে নিজের সম্পর্কে অহমিকা, আর অতের প্রতি তাচ্ছিল্য
ঝরে ঝরে পড়ছে ।

তিপুর যে বাবার ওপর এতো রাগ, তবু ভয়ও তো করে । আর মেজদা ? ‘বাবা’
নামের যে একটা মাছুষ বাড়িতে আছে, সে কথা যেন তার গ্রাহ্যের মধ্যেই নেই ।
গ্রাহ্য অবশ্য কারো সম্পর্কেই নেই দীপুর ।

ওর চালচলন দেখলে মনে হয়, ও যেন এ বাড়ির কেউ নয় । যেন প্রয়োজনে পড়ে
কোনো অনাখ্যায় বাড়িতে খেতে থাকতে হচ্ছে । তাই সেই খাওয়া থাকাটা যতটা
সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে চেষ্টা করে । কলেজে পড়ে, অথচ বাবার কাছ থেকে কোনো
খরচা নেয় না । কোথা থেকে জোগাড় করে কে জানে । ভালো ভালো জামা জুতোও
তো পরে । গুনতিতে অবশ্য বেশী নয়, তবু জিনিসগুলো দামী । ধোবা খরচ লাগে
না, ইস্ত্রীর দরকার হয় না । নিজেই সাবান কেচে ঝুলিয়ে দেয়, নিজেই এক সময়
তুলে নেয় । ওর ঘর আলাদা, গামছা তোয়ালে আলাদা, তেল সাবান আলাদা ।
সবই কিছু কিছু স্পেশাল ।

হয়তো টিউশন ফিউশনী করে । জিগ্যেস করতে গেলে এমন একথানা উত্তর দেয়,
যে অতি বেহায়াও আর দুবার বলতে পারবে না । মায়ের মতো বেহায়া লোক ও
নয় ।

মা তাই আড়ালে বলে, জানি না—কোনো বড়লোকের পুত্রপুত্র হলে, না ঘর-জামাই হতে স্বীকার পেয়েছে।

বাবার সঙ্গে দীপুর বাক্যলাপ আছে কিনা মনে পড়ে না তিপু। কিন্তু তিপু দীপুর মতো শক্ত বুক নয়, তিপু তাই বাবার ওপর যত রাগই থাক, সেধে সেধে কথা বলতে যায়। উত্তর যে পায় সব সময় তাও নয়, পেলে কৃতার্থই হয়।

এখনও অবশ্য পাবে নাই ভেবেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই উত্তরটা এলো।

বাবা চলতে চলতে ঘাড় না ফিরিয়েই বলে উঠল, সবই তো ভেঙে যাচ্ছে! ওই তুচ্ছটা নিয়ে আর আপশোস করে কী হবে!

সেই তাম্বিল্য মিশ্রিত ধাতব স্বর।

সবই ভেঙে যাচ্ছে।

কৈপে উঠল তিপু।

তবে কি মেজদির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বাবা?...তার মানে তিপুর চালাকিটাও? ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে তিপু।

লোড শেডিং-এর এও একটা সুবিধে। সব সময় সব গতিবিধিটা সকলের চোখে পড়ে না।

তিপুর হাতের একটা জোর চিমটি খেয়ে অনেকটা পিছু হটে অন্ধকারে গা মিলিয়ে মিলিয়ে বিভা যখন বাড়ির পিছন দিকের উঠোন দিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে বসে পড়ল, তখন ওর বকের ওঠাপড়াটা কেউ দেখতে পেল না তাই রক্ষে।... আলো থাকলে—নির্ধাৎ মার চোখে পড়তো, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতো, ওখানে অমন বসে পড়লি যে হঠাৎ? হাঁপাচ্ছিস বা কেন? কোথায় ছিলি এতোক্ষণ?

অতএব বলা যায় লোড শেডিং অনেক সময় কারো কারো উপকারীও।

আন্তে এক সময় নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিভাও।

ঘর এ বাড়িতে অনেক বটে, কিন্তু সকলের আলাদা আলাদা ঘর, এমন মনোভঙ্গী নেই এ সংসারের—দীপুই যা আলাদা ঘরের মাহুঁষ।

আর অবশ্য বাড়ির কর্তা।

বাকি ক'জন এই একটা ঘরেই।

একটা বৃহৎ তক্তাপোষে মা বিভা আর ছোট বোন খুকু, অত্র আর একথানা ছোট চৌকীতে তিপু।

তিপু অবশ্য ইচ্ছে করলে দীপুর মতো—স্বাবলম্বী হতে পারতো, কিন্তু ওর আবার ছুতের ভয় আছে। একবার বলেছিল, আমি এবার থেকে—তোরা এই ঘরটার

শোবো মেজদা । মায়ের ঘরে শুলে পড়া হয় না ।

দীপুর প্রকাণ্ড ঘর, অস্থবিধের কিছু নেই ।

ভাবে নি যে দাঁপু বলে উঠবে, বাড়িতে আরো অনেক ঘর আছে ।

বাঃ তোর এ ঘরেই তো কত জায়গা ।

অতএব বলার কিছু নেই ।

না, আমার অস্থবিধে হবে ।

তিপু অতএব মাতুলস্নেহক্রোড়ে ।

ভূতের ভয় দূর না হওয়া পর্যন্ত থাকতেই হবে এই অবস্থায় ।

তিপু অন্ধকারেই টের পেল, মেজদি ঘরে ঢুকলো, শুয়ে পড়লো । মেজদি টের পায় নি আমি ঘরে আছি । কিন্তু তিপুও চট করে মেজদি বলে ডেকে উঠতে পাচ্ছে না ।

যেন তিপুই কী একটা লজ্জার কাজ করে বসেছে । অথচ এই সময়ই যা মেজদির সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে । একটু পরেই তো মা খেতে ডাকবে । আর খাওয়ার পর খুকুটি এসে জুটবে । পাকার ধাড়ি মেয়ে, যেটি শুনবে মনে গেঁথে রাখবে আর কোনো এক সময়ে মার কাছে লাগাবে । তিপু তো জানে হাড়ে হাড়ে ।

অথচ মেজদির সঙ্গেই তার যা কিছু কথা ।

বাবা মার সমালোচনা (যা নাকি তিপু আর বিভার প্রধান প্রসঙ্গ) নিজেদের অকারণ গরীব হয়ে থাকার ছুঃখ, তহুদের বাড়ির গল্প এসব কার কাছে করা যায় মেজদি ছাড়া ? মেজদা তো অনেক কথা কান পেতে শোনেই না । নয়তো ঠোঁট ঝাঁকিয়ে ভুকুঁচকে বলে, থাক থাক গুঁদের কথা তুলতে আসিস না আমার কাছে । মেজাজ ঠিক থাকে না ।

মেজদি তবু তিপুকে একটা মাহুষ বলে গণ্য করে ।...তবে আজকের ঘটনায় যে মেজদি কতোটা কী হয়ে যাবে বুঝতে পারে নি ।

মেজদি বলে ডেকে উঠতে না পেয়ে তিপু হঠাৎ নিজের গায়ে একটা থান্ডা মেরে উঠল, উঃ কী মশা ।

আর তখনই বিভার গলা পেল, তিপু ! তুই এখানে ?

তারপর এ চোঁকীর ধারে চলে এলো মেজদি । গাঢ় গভীর গলায় বলল 'তিপু !

তোকে যে আমি কী বলব ! গুরুজন না হলে তোর পা পুজো করতাম ।

তিপু বলে উঠল, ধ্যাং ।

বিভা আস্তে বলল, ধ্যাং নয় রে । বাবা যদি বুঝতে পারতো, তা হলে—

তিপুও গভীর গলায় বলল, বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছে !

সে কী ? তুই তো—ইয়ে আমি তো পিঁছন দিয়ে—কেন রে ? একথা বলছিস কেন ?

মনে হলো বাবার ভাবভঙ্গী দেখে ।

বিভা একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু টর্চ ফেলার সময়ই তো তুই—কতক্ষণ এসেছিলি রে তুই ?

তিপু ইচ্ছে করেই বলল, অ—নেকক্ষণ ।

মেজদি একটু ভয় পাক ।

ভয়ই পেল বোধহয় বিভা, আস্তে বলল, সাড়া দিসনি যে ?

এখন তিপু মিছে কথা বলল, বাঃ আমি কী করে বুঝব ঠকে ওখানে । লক্ষ্য করে করে দেখছিলাম ।

বিভা একটু গুম হয়ে থেকে বলে উঠল, আলোটাও যে ঘুচে গেল ! তা দেখনি তো কে ?

হঁ !

বিভা আবার একটু গুম হয়ে থেকে বলল, ও বলছিল, ওর কে এক বড়লোক মামা না কাকা কি আছে, সে আমাদের এই জমিটার জগ্গে পাগল । বহুং দাম দিতে চায় । তাই বলছিল আমি যদি বাবাকে বলে নরম করতে পারি । জানে না তো আমার বাবাটি কী বস্ত ।...সত্যি, মানুষ যে এতো বোকা হতে পারে ভাবা যায় না !

তিপু মনে মনে ভাবছিল মেজদি মনে করছে শুধু বড়লোক মামার কথা বলবার জগ্গে লোকটা অন্ধকারে আড়াল জায়গা দেখে দাঁড়িয়েছিল এই কথা বিশ্বাস করাবে আমায় । হুঁঃ ।

কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করল না, শুধু বলল, ‘বোকা’ না বিচ্ছু ! ইচ্ছে করে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে । চিরকাল রাখবে তাই । জানে তো আমরাই ওর হাতে পড়ে আছি ।

বাপের সম্পর্কে এহেন মন্তব্য এরা করেই থাকে । আর ‘বঞ্চিত’ শব্দটা তো আশৈশব মায়ের কাছে শুনে শুনে মুখস্থ । মানেটাও অন্তরস্থ হয়ে গেছে জ্ঞানাবধি । বিভা আবার বলে উঠল, ও বলছিল, এখন নাকি পর্য্যতাল্লিশ হাজার টাকা করে কাঠা । বাবা যদি অন্তত বাড়ির সামনের অংশটাও ছেড়ে দেয় দেড় লাখ টাকা মতো পেয়ে যেতে পারে । ভাবতে পারিস তিপু ? আর আমরা ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে একদিন মাত্র মাছ খেতে পাই, কাপড় ছিঁড়ে না গেলে একখানা কাপড় হয় না কলেজের মাইনে চাই যেন চোরের মতো—

কিরিস্তি হয়তো আরো দিতে থাকতো বিভা, যদি না আবেগ ওর গলাটা টিপে ধরে বাদ সাধতো ।

হয়তো দোকানী সমীর বলেছিল এসব কথা, কিন্তু আরও কিছু কি বলে নি ? তা সেইটাকে তিপু মনের চোখ থেকে আড়াল করতেই বিভার এটার উপর জোর দেওয়া । তিপু ভাবুক, আমার হয়ে আর্জি করতেই এসেছিল সমীর ।

তিপু সেটা বুঝতে পারবে না এমন নয় । তিপু বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, যাই বলিস মেজদি, আসলে তুই আসল কথাটা চাপা দিচ্ছিস ।

আর বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল, মেজদি বাবাকে তো চিনিস, নিজের মরণ ভেঙ্গে আনিস নি । দিদির দুর্দশা ভাব !

কিন্তু তিপু এসব কথা বলে নিজের ‘পাকা’ হয়ে যাওয়াটা প্রকাশ করবে না । তিপু তখন অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ একটা বেচারী মেয়ের জ্ঞানকর্তা হয়ে পড়েছিল । এখন আবার সামলে গেছে ।

তিপু তাই বলে, কারই বা তা নয় ? মা যখন রেশনের টাকা চায়, যেন কত দোষ করেছে এই ভাব । দেবো টাকা বাবা, তবু ফি বার একবার করে শোনাবে, স্বদের ওই টাকাটা ছাড়া, আমার আর কোনো আয় নেই তা জানো বোধহয় । সরকারি চাকরী ছিল না যে পেন্সন আছে ।

কথাটা ঠিক । অফিস থেকে বিদায়কালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুইটিটি ইত্যাদি লব্ধ টাকাটা শক্তি ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপজিটে রেখে তার হৃদ থেকে সংসার চালিয়ে চলেছেন । বড়ছেলে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, নেন না । বলেছেন, থাক, তেমন দরকার হলে চেয়ে নেব । যতদিন চালিয়ে যেতে পারি যাই ।

শেফালী আগুন হয়ে বলেছে, তেমন দরকারটা তোমার কবে হবে বলতে পারো ? আমি মরলে—ছেরাদ্দর সময় ?

শক্তিভূষণ অনায়াসে জবাব দিয়েছিলেন, আরে ! সেটা আবার আমার দরকার হলো কিসে ? সে তো শান্তিভূষণের মাতৃদায় ! সে তার দু’হাতের রোজগারের টাকা এনে দু’হাতে খরচ করে মায়ের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে পারে ।

সব সময় তুমি আমার ছেলেকে ‘ঘুষ ঘুষ’ বলে খোঁটা দাও । তবু বলবো, সে তোমার থেকে ভালো । নিজের আদর্শের মহিমার ধ্বজা তুলে—জীপুত্রকে ভিথিরি করে রাখে নি ।

ভালোই ! তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার মনের মতো হচ্ছে, সেটাই মঙ্গল ।

শেফালী জলে গুঁঠে ।

আবার তুমি মেয়ের কথা তুলে আমায় ঘা দিচ্ছো ? নিষ্ঠুর পাষণপ্রাণ নির্মায়িক পুরুষ ! সর্বস্বত্বে বঞ্চিত মেয়েটা একদিন একটু হাসি আছন্দে যোগ দিয়েছিল, তুমি তাঁকে জন্মের শোধ ত্যাগ দিয়ে রাখলে । বাপের প্রাণে এতটুকু মায়্যা এলো না !

না এলো না ! কী করব বল ! তোমার মতো মায়ার শরীর আমার নয় । অনিষ্টকারী
মায়ী, আমার মতে বিষতুল্য । সাম্প্রতিক বিকারে রোগীকে মায়ী করে তেঁতুলের
আচার আর ভিজে পাস্তো দেওয়াটা যেমন মায়ী, আমার মতে এও তাই !

ও কিন্তু আর নিজে নাচতে নাচতে থিয়েটার দেখতে যায় নি, ননদ-ননদাই জোর করে
নিয়ে গিয়েছিল সর্বদা মনমরা হয়ে থাকে বলে ! শান্তুড়ীও ‘যাও যাও’ করেছে—
তা ভালোই তো । সেই মহৎহৃদয়া শান্তুড়ী—আর হিঁতৈষী আত্মীয়জনদের কাছেই
থাকল । এই নির্দয় নির্ভর হতভাগা বাপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার দরকারটা কী ?
আর ‘মা’ বলে একটা প্রাণী নেই তার ?

অকালে বিধবা হয়ে যাওয়া বড় মেয়ের মুখটা স্মরণ করে প্রাণটা ছুঁ করে ওঠে
শেফালীর । একটা সন্তান পরিস্ত হয় নি তার যে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করবে ।
সেই মেয়ে কবে একটা রঙ্গিন শাড়ি পরে থিয়েটার দেখতে এসেছিল, সেটাই বাপ
হয়ে ধরে বসে রইলে তুমি ?

হৃন্দরী বড়মেয়ে শোভার বর জুটে গিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই । পাত্র পক্ষ যেচে এসে
বিনাপণে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । অবশ্য পণ চাইলে—তাদের আর আদর্শবাদী
শক্তিভূষণের মেয়েকে নিয়ে যেতে হতো না ।

শক্তিভূষণের বাড়ির চেহারা দেখে তারা এমন প্রস্তাবেও উত্তর দিয়েছিল, এ পক্ষের
খরচটাও তারা করতে প্রস্তুত, শুধু যেন বরযাত্রীদের সম্যক সমারোহময় অভ্যর্থনা
হয় । প্রস্তাবের মুখেই হাত জোড় করেছিলেন শক্তিভূষণ, তাহলে আর এই হতভাগা
শক্তি ভট্টাচার্যের মেয়ের ভাগ্যে আপনার তিনতলা কোঠায় ওঠা সম্ভব হয় না । গোত্র
বদলের আগে পরিস্ত আমার সমগোত্রই থাকতে হবে আপনার ভাবী পুত্রবধূকে ।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে ।

অতি ভদ্রলোক বলেই হোক, অথবা মেয়েটাকে অতি পছন্দ হয়ে গেছে বলেই হোক,
তিনি আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলেন নি । সামান্য কজন বরযাত্রীকে নিয়ে এসে একটা
শ্রীহীন সজ্জাহীন নিম্নতর আসরে ছেলের বিয়েটুকু সমাধা করে ফেলে নিজের বাড়িতে
সমারোহের দৃশ্যের আমদানী করেছিলেন । অবশ্য সে দৃশ্যের দর্শক হতে যান নি
শক্তিভূষণ, শেফালীর ভাগ্যেও অতএব জোটে নি সেটা ।

এক্ষেত্রেও করযোড়ে বিনীত নিবেদন করেছিলেন শক্তিভূষণ, মা বাপের তো যাওয়া
চলে না বেয়াই মশাই, বিধি নেই জানেন অবশ্যই ।

বেয়াই ইতিমধ্যেই ‘বেয়াই’ চিনে ফেলেছিলেন, তাঁই শাস্তভাবে বলেছিলেন, ‘জানি না’
বলব না, আজকাল ওসব কেউ মানে না, সে কথাও বলব না, খাবার জন্তে পীড়া-
পীড়িও করব না, শুধু যদি একবার পায়ের ধুলো দিয়ে আশীর্বাদ করে আসেন !

তাহলে সন্ধ্যার সময় গাড়িটা পাঠিয়ে দিই।

শক্তিভূষণ গলা খুলে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, গাড়ি চড়ে কুটুম বাড়িতে শুধু একটু পায়ের ধুলো দিতে যাব, আমাকে এমন তালেবর ব্যক্তি ভেবেছেন নাকি বেয়াইমশাই? না, না, ওসব করতে যাবেন না। আশীর্বাদ আমরা এখানে বসেই করবো। সদা সর্বদাই করছি।

শেফালী সব কথাই দরজার আড়াল থেকে শুনেছে। শেফালীর বিষ নেই কুলোপানা চক্র। বেয়াই চলে যাওয়ার পরক্ষণেই শেফালী কপালটাকে চাপড়ে চাপড়ে লাল করে তুলে চাঁচিয়ে বলে ওঠে, এতো অহঙ্কার কেন তোমার? এতো অহঙ্কার কেন? মেয়ের স্বপ্নের সঙ্গ কথ্য বলছিলে যেন তোমার খাতকের সঙ্গ কথ্য কইছিলে। নিজে যাবে না যাবে না আমার যাওয়াটা স্বাক্ষর পণ্ড করলে কেন শুনি? আমি বলে কত আশা করে—বিধি নেই? নিষেধ আছে। মাঙ্কাতার আমলের শাস্তর খুলে বসলেন! আজকাল আবার কে মানে ওসব? মা বাপ যাচ্ছে, খাচ্ছে, সবই করছে। তোমারই জ্ঞাতীদের বাড়ি দেখি নি, কনের মা কনের তুল্য সেজে গুঞ্জে গিয়ে দিব্যি পংক্তি ভোজনে বসে মাংস মুরগি খেয়ে এলো!

শক্তিভূষণ স্ত্রীর দিকে একটা বছবর্ণ মিশ্রিত দৃষ্টি ফেপণ করে বলেছিলেন, ওহো হো। তোমার এসব দেখা আছে বুঝি? জানা ছিল না তো! ঠিক আছে, সাধবাসনাটা মিটিয়েই নাও তাহলে। বলে পাঠাও, কর্তার বলার ভুল হয়েছিল, তিনি যাবেন না, গিন্নী যাবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

শেফালী আজীবন দেখে চলেছে, তবু শেফালী লোকটার কথার টোন সবসময় ধরতে পারে না। তাই বলে ওঠে, আহা! একবার বারণ করে, আবার বলা, ভারী যেন গৌরব।

তাতে কী। বড়লোক বেয়াই বাড়ির ভোজে প্রাণভরে মাংস মুরগি খেয়ে আসবে, সেটা কি কম গৌরব? বাদমাথাটা ঠিক হয় নি আমার! তবে মুন্সিল হচ্ছে কনে সাজবার মালমশলা কিছু আছে কি তোমার?

এই জীবন শেফালীর!

এরপর যদি শেফালী বলে, মেয়ের সুখ ঐশ্বর্য দেখে হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে শক্তিভূষণের। খুব কি দোষ দেওয়া যায় তাকে?

কিন্তু সে সুখ ঐশ্বর্য কদিন আর সইল বেচারী শোভার? কিছুর মধ্যে কিছু না, সামান্য দু'দিনের জরে মারা গেল অমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছেলেটা।

শেফালী তখনও কেঁদে কেঁদে বলেছিল, লোকের চোখ লেগে গেল গো। আমার গভের সন্তানের এতো সুখ এত আদর সইবে কেন? দেখে লোকের হিংসেয় বুক

ফেটে যাচ্ছিল সেই আগুনে শোভা আমার পুড়ে মলো ।

কিন্তু সেটা কি আর শক্তিভূষণের উদ্দেশ্যে বলেছিল ? বলেছিল আত্মীয় স্বজনদের কল্লিত ঈর্ষাতুর মুখ ভেবে । তবে শক্তিভূষণের কান বাঁচিয়ে তো বলে নি ।

তা শোভার শব্দরবাড়ির লোকরা সত্যিই বড় ভালো । এই দুর্ঘটনায় চিরাচরিত প্রথায় বোঁকে ‘অপয়া’ বলে পিতৃগৃহে নির্বাসন না দিয়ে, বরং ‘আহা কী দুঃখিনী !’ বলে আরো স্নেহ মমতায় ডুবিয়ে রেখেছে । কী করে তার মন ভালো থাকবে সেই চেষ্টায় তৎপর ।

‘বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে ইচ্ছে হলেই চলে যেও, কোথাও যদি বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয় বোলো—’

বলে গাড়ি মজুত বাথে ।

কিন্তু সে ইচ্ছে কি যখন তখন হয় শোভার ? মানে হতো ? হতো না । সেটা হলো একটা জমজমাট আড়ম্বর ঐশ্বর্যের বাড়ি, শোকেও স্তব্ধ হতে জানেন । রাত দিন অভ্যাগত আত্মীয়ের ভিড় ! মাঝনা দানের উপলক্ষে এলেও, গালগল্প কথাবার্তার তো কামাই থাকে না ? মনের তলায় তলিয়ে গভীর গভীর হবার সময়ই পায় না বেচারী তরুণী সন্তুবিধবা ।

সেখানের তুলনায় এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগান ? প্রভাহীন, দীপ্তিহীন, বিলাস স্তব্ধহীন ! নাঃ আসতে ইচ্ছে হয় না ।

সেই ভয়ঙ্কর ‘স্বণ্য সত্যটা’ একদিন ধরা পড়ে গেল শক্তিভূষণেরই চোখে ।

কলকাতা শহরের সব থেকে নামী আর পুরনো থিয়েটার বাড়ি ছুটো তো টিয়াবাগান বাজারেরই সন্নিহিতে । কোনো এক রবিবারের ম্যাচিণী শোভাভার সময় কোনো এক প্রয়োজনে শক্তিভূষণ একটা থিয়েটারের গেট-এর সামনা সামনি গিয়ে পড়েছিলেন, দেখতে পেলেন জনা কয়েক সাজে-সজ্জায় উজ্জ্বল, হাস্তো কথায় মৃদু তরুণীর মধ্যমণি রূপে শোভা বেরিয়ে আসছে । পিছনে এক স্তব্ধ স্তব্ধ স্তব্ধ যুবক । শোভার কিছু সাজ সজ্জা আছে বৈ কি । ওদের মতো না হলেও দেখে চট করে বিধবা বলে ধরবার উপায় নেই । মুখেও নেই বিষণ্ণতার হিমশীতল ছাপ ।

শক্তিভূষণ কয়েক সেকেণ্ড প্রায় বজ্রাহতের মতোই তাকিয়ে রইলেন, তারপরই মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে যাবেন, আর সেই সময় একটা বেহায় ছুঁড়ি কিনা রাস্তার ওপার থেকে চোঁচিয়ে উঠল, এই বউদি, বউদি, তোমার বাবা !...মোসোমশাই, মোসোমশাই ! এদিকে তাকান ।

বাবা অবশ্য শুনতে পেলেন না ।

ক্রত চলে এলেন ।

কিন্তু তারাই বা ছাড়বে কেন ?

গাড়ি চড়ে আরো দ্রুত চলে এলো বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের দরজায় ।

শক্তিভূষণ এসে দাঁড়াতেই, মেয়েটা গাড়ি থেকে বলে উঠল, মেসোমশাই, আমরা ডাকলাম শুনতে পেলেন না ?

মেসোমশাই শান্ত পাথুরে গলায় বললেন, আমায় কেউ ডাকছে, বুঝতে পারি নি ।

কত জোরে ডাকলাম !...বউদি এসেছে আমাদের সঙ্গে—

বউদি ! বউদি কে ?

আর একটা মেয়ে বলে উঠল, ওমা ! এই যে শোভা বউদি । আপনার মেয়ে !

আমাদের বুঝি চিনতে পারেন নি ?

শক্তিভূষণ গাড়ির মধ্যেটা একবার অবলোকন করলেন ।

দেখতে পেলেন কাঠ হয়ে বসে আছে একজন, গাড়ির ওদিকের জানলার বাইরে চোখ ফেলে । মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু শাঁথের মতো ধবধবে ঘাড়ের একটু অংশ । আর তার উপর পড়ে থাকা হালকা নীল রঙা সিল্কের শাড়ির কোমল ভাঁজ ।

এই কোমল দৃশ্যের উপর একটা পাথরের চাঁই পড়ল, ঠিকই বলেছি, বুঝতে পারি নি ।

ভেবেছিলাম—খিয়েটারের শেষে অ্যাকট্রেসরা কেউ বেরিয়ে আসছেন ।

সঙ্গের নির্বাক যুবকটির হাতেই ছিল—গাড়ির চালনচক্র । সে সেই মুহূর্তেই সেই চক্রে হাতের চাপ দিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল ।

ঘটনাটা ঘটে গেলবাড়ির বাইরেই, তবু ভিতরে এসে আছড়ে পড়তে দেবী হলো না ।

ধবর বাতাসবাহিত হয়েও আসে । আর এ তো তিপু নামের ছেলেরা সেখানেই দাঁড়িয়েছিল ।

শেফালী বসে পড়ে বলল, এই কথা বললে তুমি !

আমার যা মনে হয়েছিল তাই বলেছি ।

যা মনে হয় তাই বলে ফেলতে হবে ? এ অপমানে যদি ওরা শোভাকে আর না পাঠায় ?

তা হলে তো শাপে বর । পাঠালে তো আবার ঢুকতে না পেয়ে ফেরত যেতে হতো ।

কী ? কী বললে তুমি ? শোভা এলে তুমি তাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না ?

নাতিরীতিহীন বিধবা মেয়েকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয় ।

উঃ ! নিজের মেয়েকে এই কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না ?

লজ্জা পাবার হিসেব তোমাদের সংস্কৃত আমায় মেলে না ।

শোভা পর্বের এইখানেই ইতি ।

বাড়িতে আর কেউ শোভা নাম উচ্চারণ করে না। যে যা করে নিভুতে।

এই যে তিপু, সেও তো মনে মনেই বলল, দেখেছিস তো দিদির দুর্দশা। মুখে নয়। অথচ ছাখ, দাদা টাকা দিতে চায়, তাও নেবে না বাবা। মাকে পর্যন্ত এমন ইয়ে করে বলবে যে, মাও লজ্জায় নিতে পারবে না। মনে আছে সেবার বউদি মার কাছে বলেছিল, আমাদের ইস্কুল-কলেজের মাইনেগুলো অস্তুত যদি দাদা দিতে পায়, বাবা শুনে কী বলেছিল মনে আছে ?

মনে আবার থাকবে না কেন ? সেই অবধি তো বউদি এ বাড়ি আসা ছেড়েছে। বলল কিনা, টিয়াবাগান বস্তুতে অনেক গরীব-গুরবো ছেলে আছে বউমা, ও টাকাটা বরং তাদের দিতে বোলো শান্তিকে। নাম হবে, পুণি হবে। ভস্মে ঘী ঢেলে কী হবে ?

বাবার মতো এমন কিছুত লোক তুই আর কারুদের বাড়ি দেখেছিস মেজদি ? জানি না ভাই, কটা বাড়িই বা দেখেছি ? এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগান গোয়ালেই তো জীবনের তেইশটা বছর কেটে গেল। দম আটকে বসে আছে—

এই সময় আলোটা জলে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই শেফালীর চাঁচাছোলা গলায় ডাক শোনা গেল, বিভা, বিভা। গেলি কোথায় ?

বিভা নীচু গলায় স্বগতোক্তি করল, যাবো আবার কোন্ চুলোয় ! তারপর দ্রুত গলা তুলে বলল, যাই—যাচ্ছি !

আবার দ্রুত গলায় স্বর নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তখনকার কথাটা যেন মাকে বলে ফেলিস নি তিপু।

মার সঙ্গে আমার ভারী গপ্পো। তবে ওই ছেলেটা তো একটা বাজে ছেলে।

বিভা জলন্ত গলায় বলে উঠল, তা আমার ভাগ্যে আবার কোন্ রাজপুত্র জুটবে শুনি ? আমি শুধু এ বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেই ঝাঁচি। বাবা কি কোনো দিন দেবে বিয়ে ? ভাববে মেয়ের বিয়ে বলে একটা কথা আছে ?...পণ দেবেন না, আদর্শ নষ্ট হবে। দিদির মতন কি রূপ আছে আমার যে—

বিভা, পীড়িগুলো পাত এসে ? রাত কম হয়েছে ?

আঃ বাবা যাচ্ছি। এই তো আলো এলো—

চলে গেল বিভা।

তখন অন্ধকারে মেয়েকে কেমন এক রকম করে যেন চলে যেতে দেখে পর্যন্ত শেফালী চিন্তায় রয়েছে। কোথায় ছিল এতক্ষণ ? রান্নাঘরের পিছনের দাওয়াতে বা বসে

রয়েছিল কেন ? কখন থেকে ? মেয়ের যে আজকাল বেশ একটু উচ্কা ভাব হয়েছে তা ঠিকই অনুভব করছে শেফালী। মায়ের দৃষ্টি হচ্ছে ক্ষরধার। ও দৃষ্টির কাছ থেকে আত্মগোপন করবার ক্ষমতা সন্তানের নেই। অন্তত তরুণী কুমারী মেয়ের তো নয়ই।

ভগবান জানেন, কোথাও কারো সঙ্গে ভাব ভালবাসা করে মরছে কিনা। রাস্তায় তো বেরোয়।

শোভার তো স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুকেও তো গেল সব। বাপের সেই অভিজ্ঞতাই বিভার কলেজে পড়ার পথ করে দিয়েছে। শক্তিভূষণের মতো প্রাচীনপন্থী লোকও বলেছিলেন, এক্ষুনি থেকে আবার বিভার বিয়ে বিয়ে করে রব তুলছে কেন ? শিক্ষা হয় নি ? থাক পড়ুক। বিয়েই যে হতে হবে, তার কী মানে ? অনেক মেয়েই আজকাল নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে।

শেফালী দেয়ালকে ঝুনিয়ে বলেছিল, ভূতের মুখে রাম নাম। মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তবেপাকেচক্রে পড়াটা চলছে। যদিও ‘যথা বয়সে’ নয়। কারণ স্কুলে ভর্তির সময়টাই যে যথা বয়সটা পার হয়ে গিয়েছিল। শক্তিভূষণের খেয়াল হয় নি মেয়ে-দেরও স্কুলে ভর্তি করতে হয়, যখন খেয়াল হলো ছ’ তিনটে বছর নষ্ট হয়ে গেছে। মেয়ে কলেজে পড়ছে, এটা শেফালীর আনন্দ।

আবার মেয়ে একা রাস্তায় বেরোবার স্বযোগ পাচ্ছে, এটাও শেফালীর আতঙ্ক। আর কিছু নয়, ভয় শক্তিভূষণকে। ওই তো আগুন চাপা মানুষ। হঠাৎ যদি টের পেয়ে যান মেয়ে কোথাও ভাব ভালবাসা ঘটিয়ে বসেছে। তা হলে যে কী করতে পারেন, আর কী করতে পারেন না, জানা নেই শেফালীর।

তাই শেফালীর মেয়ের গতিবিধির উপর সতীক্স দৃষ্টি কিন্তু ওদিকে যে আবার মেয়ের বাক্যাবলী আরো তীক্ষ্ণ। কিছু বলতে ভয় করে। মেয়ে তো নয়, যেন আগুনের থাপরা। বুঝলাম তোর ভেতরে অগ্নিস্ফালা—এই বয়সে না পায় একটু ভালো খেতে না পায় ভালো পরতে না পায় আজকের পৃথিবীর কোনো পাওনা পেতে। আর মনের অগোচর চিন্তা নেই, ‘ঘোবন জালা’ বলেও তো একটা জিনিস আছে ? গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না সেটাকে ? তাই আজকের ছেলেরা মানুষ না হয়ে বিয়ে করবো না বলে বয়স পার করে চুলের গোড়ায় পাক ধরিয়ে আর মাথার মাঝখানে টাক ধরিয়ে আইবুড়ো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিকই। আর মেয়েরাও অবিরত লেখাপড়া করে শুকনো কাগজ তুলো হয়ে উঠেও আরো কিছু পড়ে ফেলার তাল করছে বটে, কিন্তু জনতপন্থীর সোম্যা শাস্ত মূর্তিতে ক’জন ? মেজাজের পারা সর্বদাই তো সর্বোচ্চে চড়ে বসে আছে ওদের।

শেফালী বোকা হতে পারে, কিন্তু এসব সে বোঝে কই ? তার বড়ছেলের মেজাজ তো এমন নয় । তার কারণ তার পিস্তি পড়ে যাবার অবস্থা ঘটবার আগেই পেটে ভাতজল পড়েছিল ।

কিন্তু ছেলের বিয়েটা শক্তিভূষণ সাত তাড়াতাড়ি দিলেন যে ? তা হলে বলতে হয়, শক্তিভূষণ দেন নি, দিয়েছিল শান্তিভূষণের ভাগ্য । অফিসের ‘বস’ তাঁর এক বন্ধু কল্লার জন্তে উঠে পড়ে লেগে শক্তিভূষণের ভাঙা উঠোনের মাটি নিয়েছিলেন এবং শেষ অবধি সফল হয়েছিলেন ।

শক্তিভূষণের হাতে তখন যুক্তির অস্ত্রটা দুর্বল ।

ছেলের এখনো বিয়ের বয়স হয় নি ?

ছাব্বিশ বছর বয়সটাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না ।

ছেলের উপার্জন যথোপযুক্ত নয় ?

তার ব্যবস্থা তো তিনিই করে দিচ্ছেন । ‘বস’ যখন ।

শ্বশুরের সাহায্যে পদস্থ হওয়াটা পুরুষের পক্ষে অ-পদস্থ হওয়ারই প্রমাণ ?

কা আশ্চর্য ! শ্বশুর কোথায় ? এখনো তো হিতৈষী বস ! তা ছাড়া শ্বশুরের ব্যাপকও যদি ‘শ্বশুর’ বলতে হয়, তা হলে তো অবস্থা অচল ।

শেষের কথাটা স্বয়ং শান্তিভূষণের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল । অথচ একে ঠিক অবিনয়ও বলা যায় না, বিয়ে পাগলামিও নয় । কর্মক্ষেত্রে উন্নতি কে না চায় ? শক্তিভূষণ যদি উন্নতিকে ‘অবনতি’ বলতে চান, সেটা তাঁরই মনের দোষ । অথবা হৃদয় ঈর্ষা । যেটা ক্লান্তি ছেলের প্রতি অকৃতি বাপের অবচেতনের খেলা ।

শেফালীর প্রকাশভঙ্গীতে কোনো সূক্ষ্মতা নেই, তাই শেফালী অনায়াসেই বলে বসে, আমি সব বুঝি । ছেলের বাড়বাড়ন্ত দেখে হিংসেয় কুরে খায় তোমায় । তাই এই সব লম্বা লম্বা আদর্শের বুলি আর ছেলেকে ‘ঘুষখোর ঘুষখোর’ বলে গায়ের ঝাল মেটানো ।

এসব কথার অবগু উত্তর দেন না শক্তিভূষণ, অবজ্ঞায় ঘুণার হাসি হেসে সরে যান । এতোবার ডাকতে হয় কেন ? অ্যা ? সেই থেকে থেকে মরছি ।

মায়ের অনুযোগে বিভা অবহেলায় বলে, দেবী আবার কী ? পাখি হয়ে উড়ে আসবো না কি ? তোমার দাদাশ্বশুরের ওই দালানখানি পার হয়ে আসতে সময় কম লাগে ?

দেয়ালে ঠেসানো ভারী ভারী কাঁঠাল কাঠের পীড়ি ক’খানা দুম দুম করে মাটিতে পেতে ফেলে বিভা !

শেফালী জামবাড়িতে রাখা রুটির গোছা থেকে গুণে গুণে বড় বড় থালায় সাজাতে

সাজাতে বলে, আমারই দাদা স্বস্তর ? তোদের কেউ নয় ?

আমাদের আবার কে ? কেউ না ! আমরা তো আগাছা পরগাছা ।

তা ভালো ! পর গোস্বর হবার আগেই নিজেকে পর ভাবতে শিখেছি।

যা সত্যি । তাই ভাবতে হয় । মেয়ে যে কী দিদিই তার সাক্ষী !

দিদির নাম মায়ের সামনে বড় একটা করে না কেউ, আজ করে ফেলল বিভা ।

শেফালী নিঃশ্বাস ফেলে বলে, একের পাপে আরের দণ্ড ! তোদের নির্মায়িক বাপ
নিজের চালে চলবে, যা খুশী করবে, তার দায়িক হই আমি ।

তোমায় কেউ দায়িক করে নি বাবা, দোহাই তোমার কেঁদো না ।

গলা তোলে বিভা, তিপু, খেতে দেওয়া হয়েছে । তারপর রান্নাঘরের একধারে
রক্ষিত একটা ইঁট ঠেসানো তেপেয়ে সরু চৌকীর উপর ঘুমিয়ে থাকা ইতাকে ঠেলা
দিয়ে ভাক দেয়, খুকু এই খুকু, ওঠ । খাবি না ?

এটা বিভার নিত্য কর্ম ।

মা যতক্ষণ রাঁধবে ইভা মায়ের কাছ থেকে নড়বে না, মা যত আনাগোনা করবে,
ইভা ততক্ষণ তার পায়ে পায়ে ঘুরবে আর সন্ধ্যে পার হয়ে গেলেই ওই তেলটিটে
চৌকীটায় শুধু কাঠের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে ।

ঠাণ্ডা কাল হলে শেফালী হয়তো তার নিজের একটা ময়লা শাড়ি পাট করে চাপা
দিয়ে দেয়, বেশী ঠাণ্ডায় হয়তো একটা হেঁড়া পুরনো র্যাপার ।

‘ঘরে গিয়ে শো’, বললে সহজে যেতে চায় না ।

দীপু সাধারণত রাত করে ফেরে, বাপের সঙ্গে একসঙ্গে খায় না, পরে খায় । তবে
দৈবাৎ কোনোদিন সকাল সকাল ফিরলে, মায়ের কাছে এসে তাড়া দেয়, আমায়
আগে চটপট দিয়ে দাও দিকি । মালিকের আগে খেয়ে নিয়ে কেটে পড়ি ।

তখন খেতে খেতে চারিদিক তাকিয়ে বলে, তোমার এই রান্নাঘরের দৃশ্যটি মাদার
যে কোনো সিনেমা ডিরেকটরের কাছে লোভনীয় । একশো বছর আগের একটি
গ্রামীণ রান্নাঘরের ছবি তুলতে চাইলে, গ্রামে গিয়ে ঘুরে মরতে হবে না । অবশ্য
গ্রামেট্রামেও এখন আর সহজে এমন প্রাচীন দৃশ্য মেলে কিনা সন্দেহ ।

হয়তো কথাটা আতিশয্য নয় । আলকাৎরা মাথানো ভারী ভারী কাঠের কড়ি
বরগায় লাগানো লোহার আংটা থেকে দড়ির শিকে ঝুলছে, এমন দৃশ্য এ যুগে
বিবল । কিন্তু নতুনত্ব আনবার উপায় বা কোথায় শেফালীর ? যা আছে তাই
নিয়ন্ত্রেই তো চালিয়ে চলেছে । চিরকাল । রান্নাঘরে যেমন গোটা পাঁচ ছয় গুরুত্ব
আংটা আছে, তেমনি রান্নাঘরের ধারে কাছে গোটা আট দশ মেঠো ইটরের
আনাগোনাও তো আছে । আত্মরক্ষার ওইটাই সহজ উপায় ।

কত কত দিন কি ভাবে না শেফালী একদিন ওই একটা আংটায় দড়ি বেঁধে নিজেই
ঝুলে থাকবে। ইঁা, অনেক অনেক দিন ভেবেছে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।...ঠিকমতো
দড়ি জোগাড় করা যায় না, দড়ি বাঁধতে অত উঁচু টুলই বা কই বাড়িতে? তা ছাড়া
রান্নাঘরের তিন তিনটে দরজার একটারও তো জুড়কো নেই, ইট ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে
রাখা হয়। খিল ছিটকিনি খোলা দরজা দরজা ঘরে ওই সব করতে এসে যদি ধরা
পড়ে যেতে হয়? ...ছ' ছটা ছেলে মেয়ে, ছোট থেকেছে তো কিছুদিন করে হঠাৎ
ঠিক সেই সময় মাকে বিছানায় না দেখে যদি ভেকে ওঠে।

আর শক্তিভূষণের তো চিরকাল ঝাঁঝের পাখার মতো পাতলা ঘুম।...তা হলে কী
কী হতে পারে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা মনে করেই শেফালীর সকল জ্বালা জুড়িয়ে
ফেলবার বাসনাটা আর মটোনো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সকালে উঠে লক্ষ কাজের নাগপাশে বাঁধা মনটায় রাত্রের কল্পনাটা অবাস্তব লাগে।
...আবার আস্তে আস্তে আশার ছলনা মোহময় রঙিন ছবি খুলে ধরে।

যদি শক্তিভূষণের সন্মতি হয়, যদি শক্তিভূষণ তাঁর অপরাধের জাতিদের মত—
পিতৃপুরুষের ফেলে রেখে যাওয়া মাটির বিনিময়ে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত
করে ফেলেন, তা হলে তো আর শেফালীর এতো জ্বালা থাকে না। 'দারিদ্র্যের তুল্য
জ্বালা নেই।' শেফালীর অন্তত এই ধারণা।

ওই জ্বালাটার পিছন পিছনই তো লাইন দিয়ে এসে দাঁড়ায় আরো বহুবিধ জ্বালা।
ছেলেমেয়েদের সদা সর্বদা অসন্তোষ আর অভিযোগের জ্বালা, আত্মীয়জনের কাছে
ছোট হয়ে থাকার জ্বালা, সামাজিক জীবনে প্রতি পদে খুঁড়িয়ে চলার জ্বালা,
আর সেই খুঁড়িয়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়ার জ্ঞাত সকলের কাছ থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জ্বালা।

বিচ্ছিন্ন তো বটেই।...শক্তিভূষণের নীতি—দামী দামী উপহার হাতে নিয়ে না
যেতে পারলে বড়লোক জ্ঞাতি কুটুমের বাড়ি যাওয়া চলবে না? তা হলে সেই
চলটাই বাদ দাও।

সবাই তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে-সাদী ভাত-পৈতেয় তোমায় নেমস্তন্ন করে, তোমারও
একবার আধবার না করলে মুখ থাকে না? তা হলে এর পর থেকে যারা নেমস্তন্ন
করতে আসবে, তাদের জানিয়ে দেবে তোমার নেমস্তন্ন নেওয়ার অক্ষমতার কথা।
...সম্পর্কটা যখন লেনদেনেই দাঁড়াচ্ছে, তখন সম্পর্কের বন্ধনটাই শিথিল করে ফেলা
ভাল।

বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে, তাকে সিঁকাড়া রসগোল্লা খাওয়াতেই হবে এমন কী
কথা? লোকে বেড়াতে আসে গল্প করবার জন্তে, দেখা করবার জন্তে, চা সিঁকারা

খাবার জন্তে নয় ।

পুজো ? ব্রত নিয়ম, মানসিক ?

সেটা তো হৃদয়ের ভক্তির ব্যাপার, তার জন্তে এতো উপচার আড়ম্বরের কী দরকার ? পাঁচশো টাকার পুজো হলেই ঠাকুর নেবেন, পাঁচ পয়সারটা নেবেন না ? তা হলে তেমন ঠাকুর পুজো করায় পুণ্য নেই, বরং পাপ আছে ।

অস্ব্থ বিস্ব্থে ?

বড় ভাক্তার না আনতে পারলে বড় অস্ব্থ সারবে না ? এতো আহাম্মকের ধারণা । সারবার হলে তুলসীপাতার রসে সারে, না সারবার হলে ধনুস্তরির বাবাকে ডেকে নিয়ে এলেও সারে না ।

সারা জীবন ধরে শেফালী শুধু এই রকম সব মহৎ মহৎ বাণী শুনে এলো । ...শক্তিভূষণের একটা হোমিওপ্যাথির বাস আছে, আর একটা সরল গৃহচিকিৎসার বই । আগে আগে ওই চিকিৎসাই সার ছিল, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে পর্যন্ত আর বাবার গুম্বুধ খেতে চায় না । শেফালী তো কোনো কালেই না ।

কিন্তু কবেই বা চিকিৎসার দরকার পড়েছে শেফালীর ? ভগবানও তার প্রতিপক্ষ বৈ কি । না হলে জীবনে একটা শত্রু অস্ব্থ হয় না একটা মানুষের ? খেটে খেটে যে মানুষটা হাড়সার ।

ভারী দুঃখ হয় শেফালীর ।

আত্মহত্যাটা যখন করে উঠতে পারে না, তখন কতদিন ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হার্টফেল করার কত কাহিনীই তো শুনেছি, আমার ভাগ্যে তেমন হয় না ? সকালে উঠে সবাই দেখল শেফালী—

তেমন দৃশ্যের কথা ভেবে ভেবে শেফালী কতদিন নিজের শোকে নিজে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে । কিন্তু তেমন ঘটনার নায়িকা হওয়া তার ভাগ্যে হয়নি ।

চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মতই সকালবেলা সবাই উঠে দেখে চলেছে শেফালী উম্মনে আগুন দিচ্ছে, বালতি নিয়ে জল ডরছে, চাল ধুচ্ছে, উম্মন ধরলে চায়ের কেটলী চাপাচ্ছে ।

শক্তিভূষণও অবশ্য নিয়মের চাকায় বাঁধা । যখন অফিস যেতেন, তখন একটা নিয়ম ছিল, এখন অত্যাচারী । সে নিয়মের প্রথম কাজ ‘বাগানের’ তদারকী করা । মাটি খুঁড়ছেন, চারা পুঁতছেন, মাচা বেঁধে লতানো গাছকে তার উপর তুলছেন । এ সময় ছেলেমেয়ে ওঠে না, শেফালীই নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখে ।

আর সকালের এই নমনীয় আলোয় এক এক দিন শেফালীর মনটা একটু নমনীয়

হয়ে পড়ে। কাছে এসে দাঁড়ায়, বিগলিত বিগলিত গলায় বলে—চিরটা কাল তো
আপিসের চাকরি করলে। এ সব শিখলে কবে বলো তো ?

শক্তিভূষণ অবশ্য এসব কথার উত্তর দেওয়া নিশ্চয়োজ্ঞান মনে করেন, আপন কাজ
করে যান।

শেফালীও কথার প্রত্যাশা করে না।

হয়তো আর একটু তাকিয়ে দেখে বলে ওঠে, ওমা, সীম গাছটায় যে অনেক সীম
ধরেছে।

কৃপা হলে শক্তিভূষণ হয়তো একটু হাসেন, বলেন, আশ্চর্য তো। সীম গাছে সীম
ফলেছে।

শেফালী কৃতার্থমগ্ন মুখে গলা নামিয়ে বলে, আহা ! তোমার সব তাতেই ঠাট্টা !

কোনো কিছুতেই ঠাট্টা নেই শক্তিভূষণের, যা আছে তিক্ত ব্যঙ্গ, এবং তার ছলের
জালা শেফালীর হাড়ে হাড়ে জানা। তবু এ রকম এক একটা মহামুহুর্তে এ ধরনের
একটু কথা বলে স্তূথ পায় শেফালী।

কিন্তু এমন মহামুহুর্ত ক’দিনই বা আসে ? পর দিন সকালেই হয়তো ঘুমন্ত ছেলে
মেয়েদের কানে আছড়ে আছড়ে এসে পড়ে মায়ের তীব্র তীক্ষ্ণ আক্ষেপ।

হিসেবের দু’ দিন আগেই কয়লা ফুরলো কেন তার কৈফিয়ত দিতে হবে ? কয়লা
আমি খেয়েছি। সকলের থেকে পেটের জালা বেশী তো ! তাই মুঠো মুঠো পার করে
অসময়ে ফুরিয়েছি ! হল ? হিসেব পেলে তো ?

এই হচ্ছে বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের বাসিন্দাদের দিনের বাণী।

অথচ এখন এই সমস্ত কটুতা, তিক্ততা নীচতা আর কুশ্রীতার অবসান হয়ে যেতে
পারে। কিন্তু যার হাতে সেই অবসানের ভার, সেই দারিদ্র্যের অহঙ্কারে মদমত্ত
আত্মপ্রেমী লোকটার কি সত্যিই হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই ?

কে জানে আছে কি না। সে তো তার ‘দিনের বাণী’ কাউকে দেখতে দেয় না।...

হ্যাঁ, তার একটা খাতা আছে। সেই খাতার সাক্ষী তার ভাড়া লড়বড়ে টেবিলটার
উপর রাখা লম্বা গলা চিমনি বসানো কেরোসিন ল্যাম্পটা।...এই টেবিলটায় নাকি
শক্তিভূষণের বাবা সত্যভূষণ লেখাপড়া করেছেন। পরে শক্তিভূষণও করেছেন।
বাবাকে খুব বেশী মনে পড়ে না শক্তিভূষণের, শুধু ওই দৃশ্যটাই মনে পড়ে। টেবিলের
ধারে মাথা নীচু করে বুঁকে বসে বাবা কী লিখছেন। বাবার মুখের রেখায় রেখায়
টেবিল ল্যাম্পের আলোর আভাস।

সেটা কিন্তু এ আলো নয়, বিদ্যুতের আলো।

বাবাই না কি এই ভটচাষি বাড়িতে প্রথম বিদ্যুতের আলো আনিয়েছিলেন রাস্তা থেকে লাইন টেনে। সেটা শক্তিভূষণের দেখা নয়, মায়ের মুখে শোনা। জ্ঞাতিরা না কি এই আলো আনাটাকে ‘ফ্যাসান’ বলে অভিহিত করেছিলো, বলেছিলো ‘বিলাসিতা বাবুয়ানা’, তারপর আবার না কি নিজেরাও ঝপাঝপ সেই ফ্যাসানে গা ঢেলেছিল।

তা এই ধরনের পরিবেশে এই রকমই তো হয়ে থাকে।

সত্যভূষণের আগের জেনারেশনে যখন রেড়ির তেলের প্রদীপের জায়গায় কেরোসিন এসে ঢুকেছিলো, তখনও ওই ফ্যাসানের কথা উঠেছিলো বৈ কি। তার সঙ্গে একথাও উঠেছিলো, ওই কেরোসিন কোনদিন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সব ধ্বংস করবে। অতঃপর আবার একে একে সবাই—

সত্যভূষণের বিজলী আলোর প্রবর্তনের প্রধান কারণ জ্যোতিষ চর্চা করতেন তিনি, এবং সন্ধ্যার পরই তাঁর কাছে খন্দের সমাগম হতো। তিনিও তো জাহাজ ঘাটায় না কোথায় চাকরি করতেন। সন্ধ্যাটাই তাঁর শৌখিন জ্যোতিষ চর্চার অবসর। লোকের করকোষ্ঠি বিচার করতে জোর আলোর দরকার। বাবা জ্যোতিষ চর্চা করতেন, তার জন্ত মায়ের মুখে আক্ষেপও শুনেছেন বৈ কি বালক শক্তিভূষণ, ‘ওই জ্যোতিষ জ্যোতিষ’ করে মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছিল শেষ অবদি। ওই ধ্যান-জ্ঞান! আপনিও না কি লোকের হাত দেকে দেকে সব বলে দিতেন। ...লোকেদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে কুষ্ঠি মিলিয়ে দিতেন। ...তা এমনি মানুষ, কখনো কান্নার কাচ থেকে একটা আদলা নিতেন না। ...লোকে সেদে দিতে এলেও না। বলতেন এ হলো স্বর্গীয় বিত্তে, এ বেচে পয়সা নেবো? তা ছাড়া জানিই বা কতটুকু? বুঝিই বা কী? এই রেষ্টো নিয়ে ব্যবসা ধরবো? ছিঃ।

বাবার গল্পই ছিল শিশু শক্তিভূষণের কাছে সব থেকে প্রিয় গল্প। সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম সেরে মা যখন ছেলেকে কাছে ডেকে বলতো, আয় থোকা গপ্পো বলি—কিশের গপ্পো শুনবি? রাজা রাণীর? বাঘের? ভূতের?

তখন থোকা বলে উঠতো, বাবার গপ্পো মা, বাবার গপ্পো।

মার কঠে বিধাদের স্বর বাজতো, তাঁর গপ্পো আর রোজ রোজ কী শুনবি বাবা? রাজা রাজড়া তো ছিলেন না বীরটরও ছিলেন না, গেরস্ত মানুষ! কতোই বা গপ্পো!

তা হোক! ‘মানুষটার’ গল্পই শুনতে চায় একটা আকুল শিশুমন যার অহুভূতির জগতে রেখায় রেখায় আলোর বর্ডারটানা একখানা মুখ স্থির হয়ে আছে।

বাবা আপিস ঘাবার সময় কোর্ট পরতো মা?

ছি বাবা ! ‘পরতো’ বলতে নেই, বলতে হয় পরতেন । হ্যাঁ, কোট পরতেন বৈ কি । ফর্সা কাপড়, ফর্সা কামিজ, আর কালো কোট । খুব মানাতো, খুব সোন্দর মানুষ ছিলেন তো । তোকে সবাই ফর্সা ছেলে বলে, তুই তাঁর কাছে দাঁড়ালে কালো ।

বাবার কেন ফটোগ্রাফ নেই মা ? বোকনদার বাবার তো ফটোগ্রাফ আছে ।

বোকনদার বাবা বলচো কেন খোঁকা ? জ্যাটামশাই বলবে তো ? তা তিনি বাইরে বাইরে কাজ করতেন, কত সায়েব স্ববোর সঙ্গে আলাপ ছিল, তারাই কেউ একটা ফটক তুলে দেচেন । ইনি তো আলা ভোলা মানুষ ছিলেন ! ও সব মন ছেল না । একন ভাবি । থাকলে একখান ঠাকুর ঘরে রেকে দিতুম ।

নাঃ ঠাকুর ঘরে রাখবার মত কোনো ছবি ছিল না সত্যভূষণের । শক্তিভূষণের মা তাই এতোটুকু একটি মন্দির বানিয়ে, এতোটুকু একখানি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, নিত্য পূজা করতেন সেটি ।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা ।

যেমন ক্ষমতা, তেমন মন্দির ।

তুলসী মঞ্চেরই সমগোত্র । চুড়োর ত্রিশূল-ফিশূল নিয়ে বড়জোর হাত তিনেক উচু । তার মধ্যেই এতোটুকু দরজা দেওয়া একটু ঘর ।

ভাস্করের সঙ্গে তো কথা চলে না, সব থেকে বড়জা যিনি তখনো বাড়ির গিন্নী তাঁর কাছেই ইচ্ছা জ্ঞাপন ।...তা অল্প রয়েলে বিধবা হয়ে যাওয়া ভাদ্রবধূর এই করণ ইচ্ছাটির মর্দাদা রেখেছিলেন ভাস্কর । সদর দরজার ডান দিকে স্থাপিত চির-কালের তুলসী মঞ্চেরই গড়নের আর কাছাকাছি মাপের ওই মন্দিরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন দরজার বাঁ দিকে ।

এটা শক্তিভূষণের স্পষ্ট মনে আছে ।

মন্দির বানাতে না কি হিঁচু মিস্তিরি আনতে হয়, আর ঠাকুর পিতিষ্ঠে করতে পুরুত মশাই । বার উঠোনের ওইখানে অনেকটা জায়গা গোবর মাটি লেপা হয়েছিল, আর সেখানেই পূজার আয়োজন সাজানো হয়েছিল । পুরুত মশাইয়ের জন্তে আসনও পাতা হয়েছিল সেখানে ।...ঘটা কাঁসরও বেজেছিল । শক্তিভূষণের খুব ইচ্ছে হয়েছিল সে কাঁসরটা বাজায়, কিন্তু বড়জ্যাঠার ছেলে তাঁটুদা, কিছুতেই সেই অধিকারটা ছাড়েনি । বলেছিল, তুই ছেলেমানুষ হাতে লাগিয়ে ফেলবি ।

শক্তিভূষণ অতএব ঘোমটা দিয়ে করজোড়ে বসে থাকা মায়ের দিকেই তাকিয়ে বসেছিল ।...এক আধবার ঘোমটা একটু সরে যেতে অবাক হয়ে দেখেছিল শক্তি, মায়ের ওই পাশফেরা মুখটায় রেখায় রেখায় বাবার মুখের মতই আলো । অথচ ওখানে কোনো টেবিল ল্যাম্প ট্যাম্প ছিল না । শক্তি চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল

আলোটা কোথা থেকে আসছে ।

দুর্জয়ার ধারের ওই মন্দিরটা মায়ের সেই একান্ত প্রার্থনার বস্তু । তিপুবা যাকে ঠাট্টা করে বলে, বাবার সাধের মন্দির । আর ইচ্ছে করে আকাচা জামা প্যাণ্ট পরে একটু ছুঁয়ে দেয় ।

বাবার সেই ইলেকট্রিক আলোর বাল্ব বসানো টেবল ল্যাম্পটা একবার বড়জ্যাঠামশাই কী কাজে যেন নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আর সেটা দেখতে পায়নি শক্তিভূষণ নামের সেই ছেলেটা । ছেলেটা একটু রগচটা ছিল, অনেকবার বলেছিল মাকে, যাচ্ছি আমি বড়জ্যাঠার কাছে । জিগ্যেস করি, বাবার আলোটা কোথায় গেল ?

মা ‘চুপ চুপ’ করে থামিয়েছে ।

আমার বাবার জিনিস না !

তা হোক, গুঁরও তো শাইয়ের জিনিস, খবরদার যেন কোনোদিন বলে ফেলো না । এখনো কদাচ কদাচ তিপুকে জিগ্যেস করে উঠতে ইচ্ছে করে শক্তিভূষণের, ইয়ারে তনাদের বাড়িতে এরকম কোন টেবলল্যাম্প দেখেছিস কখনো, যেটা দেখতে একটা হাত উচু করা মাছঘের মতো, সেই উচু করা হাতটায় আলোর বাল্ব ।

ইচ্ছে করে বলেন না ।

কে জানে, কী উত্তর দিয়ে বসবে তিপু । হয়তো বলে উঠবে আমি বুঝি ওদের বাড়ির সব জিনিস দেখে বেড়াই ?

নয়তো বলে বসবে, নিজে গিয়ে একবার দেখলেই পারে । নিজের লোক, পাশের বাড়ি । গেলে কী হয় ? কতবার তো নেমস্তন্নও করেন পুষ্পকাকা ।

তা করেন বটে !

শক্তিভূষণের ওই জ্ঞাতিভাই পুষ্পভূষণ মাঝে মাঝেই নেমস্তন্ন করে । ছেলের পৈতৃক করেছে, বড়মেয়ের বিয়েও করেছে, ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে করে । যা করে তাতেই ঘটা ! ওর ওই চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির যত ভাড়াটে সবাই এসে জোটে পুষ্পভূষণের দোতলার হলএ । বাঙালী অবাঙালীতে গিস গিস করে সিঁড়ি । শক্তিভূষণের পোষায় না ।

পুষ্পর মেয়ের বিয়েতে একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, তা সে শুধু দাঁড়ানোই । আর যান না, নিমন্ত্রণ রক্ষার দায় ছেলে-মেয়েদের আর শেফালীর ; তাওতো হকুম আছে সাজসজ্জার অভাব অথবা—উপহার দ্রব্যের ঘাটতিতে যদি নিজেকে নীচু মনে হয়, যাবার দরকার নেই । শেষ অবধি তিপু আর বিভাই রেখেছে সম্পর্কটা ।

অতএব শক্তিভূষণের কোনোদিন আর দেখা হয়নি, সেই হাত উচু করা মাছঘের

চেহারা দেওয়া টেবলল্যাম্পের স্ট্যাণ্ডটা ওদের বাড়ি আছে কিনা।

শক্তিভূষণ যে টেবল ল্যাম্পটা জালেন, সেটাকেরোসিনের, নিজের কেনা। কেরোসিন-টাকে উনি বলেন স্বাধীন আলো। বিদ্যুতের খেয়ালে চলে না। নিজের হাতে তার চিমনি মোছেন, নিজের হাতে তেল ভরে রাখেন। আর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, বাড়ির সব আলো নিভে যায়, তখনই ওই ভাঙাচোরা চারচৌকো তিনপুরুষের টেবিলটায় সেই আলো বসিয়ে তাঁর দিনের প্রার্থনার খাতাখানা খুলে বসেন।

আজও বসলেন।

লিখলেন, মা, তুমি ছিলে সহায়-সম্বলহীন ছোট্ট একটা মেয়ে, (‘ছোট্ট’ ছাড়া কী, বাবা যখন মারা গেছেন, তখন তো তুমি বিভার থেকেও অনেক ছোট।) সেই যুগের বিধবা মেয়ে। তোমার কী ছিল বল? না টাকা পয়সা, না অধিকার না সাহস।... শতুরের ভিটের এই মাটির একটু ভাগের আশ্বাস ছাড়া আর কিছু না।...তবু সেই তুমি তোমার ছেলটাকে একটা উচ্চ আদর্শের শিক্ষা দিতে পেরেছিলে। শিক্ষা দিয়েছিলে লোভের কাছে পরাস্ত না হবার, গুরুজনকে মাগ্ন্য করবার, গুরুজন অগ্রায় বললেও নীরবে মেনে নেবার।

আমি যখন বলতাম, জ্যোতিমা তোমায় এতো খাটায় কেন? তোমায় এতো বকে কেন? তোমায় কিছু দেয় না কেন?

মা, তুমি তখন শিউরে উঠে বলতে, ছি ছিখোকা। এই বুদ্ধি হচ্ছে তোর? আর কক্কনো বলবি না এসব কথা।

মা, তুমি একটা ছোট্ট মেয়ে হয়েও তোমার ছেলেকে তোমার ইচ্ছেয় চালিত করতে পারতে। কিন্তু আমি? আস্ত শক্তপোক্ত একটা পুরুষ। আমি ফেলিগর। আমি আমার সন্তানদের মধ্যে আমার ইচ্ছেয় চারা, আমার আদর্শের বীজ বপন করতে পারি নি।...আমার বড়ছেলে ঘুষখোর, আমার মেজোছেলে উদ্ধত অবিনয়ী বিলাসী। ভগবান জানান কোথায় কীভাবে নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে সে তার বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করে। আর আমার ছোটছেলে? মেরুদণ্ডহীন লোভী। একটু ভাল মন্দ খেতে পাওয়ার লোভে সে তার বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ধর্না দেয়।...আমার বড়মেয়ে? বৈধব্যের পবিত্রতার ধার ধারে না সে। অথচ গুর থেকেও কম বয়েসে তুমি—ই্যা আমার জ্ঞানাবধি তোমায় আমি বৈধব্যের শাস্ত স্তম্ভর স্তম্ভ পবিত্রতার মূর্তিতে দেখে এসেছি।...আমি কোনোদিন তোমায় চৈতন্যে কথা বলতে শুনি নি, জোরে হেসে উঠতে শুনি নি। তোমায় কোনো উৎসব আনন্দের মধ্যে দাঁড়াতে দেখি নি।...এই ভট্টাচার্য গোপ্তিতে এ বাড়ি ও বাড়ি বিয়ে-টিয়ে তো লেগেই

থাকতো, তুমি থাকতে ভাঁড়ার ঘরে রান্নাঘরে পুজোর ঘরে ।...আর তোমার পোঁজী ?...থাক তার কথা । আমার মেজ মেয়েও তো কুমারীর শালীনতায় বিশ্বাসী নয় । পরপুরুষকে প্রাশ্রয় দিয়ে বাড়ির মধ্যে ডেকে এনে লুকিয়ে অন্ধকারে প্রেমালাপ করতে বাধে না তার ।

মা, একদিন হাতে-নাতে ধরতে পারলে আমি ওই মেয়েকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবো তা তোমায় জানিয়ে রাখছি ।...জানি না আমার ছোটো মেয়েখানি পরে কী হবে !...শিক্ষার মূল বনেদ যেখান থেকে গড়ে ওঠার কথা, সেখানে ওদের শূত্রের অঙ্ক ।

মা ! ওরা ওদের মায়ের কাছ থেকে কী পেয়েছে ? কোনো সদগুণ না । পেয়েছে শুধু অসন্তোষের শিক্ষা, অভিযোগের শিক্ষা, অসহিষ্ণুতার শিক্ষা ।

কিন্তু আমি কি এ লড়াইয়ে হেরে যাব ? তোমার আদর্শের শক্তি বার্থ হবে ? নাঃ । কিছুতেই না । আমি লড়ে যাব ।

লিখলেন, তারিখ লিখলেন, তারপর লেখা পাতাগুলোকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে মুড়ে পাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন । ওই বাইরেটা অবশ্য বাড়িই মধ্যে । ওখানে একটা মন্ত গর্ত কাটা আছে, যেটা ডাস্টবিনের অন্তর্কল্প । আসলে গুল দেবার জন্তে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ওখানটায় গর্ত করে তোলা হয়েছে ।...কাঠের গরাদে দেওয়া ছোট্ট খুপরি জানলা, কষ্টে হাত গলানো যায় । তবু এটাই পদ্ধতি শক্তিভূষণের । বেশী রাত্রে কেরোসিন জেলে পাতা পাতা লিখে, সেটা ছিঁড়ে কুচিয়ে ফেলে দেন । হয়তো বা দেশলাই কাঠি জেলে পুড়িয়েও ।

তবু লেখা চাই ।

কোনো কোনো দিন কোলের মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শেফালী একটু প্রত্যাশা প্রত্যাশা মুখ নিয়ে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে আস্তে ঘরে ঢুকে বলে, এত রাত অবধি জেগে কী এতো লিখছ ?

শক্তিভূষণ লেখায় বই চাপা দিয়ে বলেন, জেনে তোমার কোনো কাজ হবে না ।

তা জানি । তোমার মনের কোন্ কথাটাই বা আমায় জানতে দাও । আমি তো তোমার সংসারের রান্না করার দাসীবাঁদি—

রাগ করে বেরিয়ে যায় দরজাটা টেনে না দিয়েই ।...এই ঘরটা ভেতর বাড়ি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, সাবেককালে একে বলা হতো বৈঠকখানা ।...খানিকটা উঠোন পার হয়ে হুঁতিনটে সিঁড়ি উঠে দাওয়ার ওপর এই ঘর ।

আগে ভিতর বাড়িতেই অবস্থান ছিল শক্তিভূষণের, ইতার জন্মের পর থেকে এই বৈঠকখানা ঘরে আস্তানা গেড়েছেন । শেফালী অবশ্য এতে খুবই মনঃস্ক্ল, স্ক্ল,

আহতও ।...ছেলেমেয়েদের সামনে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, একটেয়ে একথানা ঘরে একা পড়ে থাকার যে কী মানে বুঝি না ।...রাতবিরেতে কোনদিন শরীরটা যদি একটু খারাপই হয়, পচা পুরনো বাড়ি, কত রকম পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ, কামড়ে দিতেও পারে । চেঁচিয়ে ডাকলেও তো শোনা যাবে না । এদিকে কি ঘরের অভাব ?

এমনিতে এসব কথার উত্তর দেন না শক্তিভূষণ । দৈবাৎ মেজাজ হালকা থাকলে একটু হেসে বলেন কীট-পতঙ্গ বলে আর মায়া বিস্তার কেন, বল না—সাপথোপ । তা জানো তো শাস্ত্রে আছে সাপের লেখা আর বাঘের দেখা । বাঘের সঙ্গে দেখা হলেই বিপদ । কিন্তু সাপে কাটা জন্মকালেই কপালে লেখা থাকে ।...আর লেখা থাকলে লোহার বাসরেও—তক্ষক হয়ে দংশায় । নচেৎ সাপের গর্তয় হাত ঢোকালেও নয় ।

শেফালী খুব রেগে যায় ।

বলে, তোমার সঙ্গে যে কথায় পারবে সে এখনো তার মাতৃগর্ভে আছে ।...আর ছেলেদের আড়ালে চাপাগলায় বলে, ভয় নেই কোর্টে পেয়ে কেউ তোমার ধর্ম নষ্ট করতে যাবে না । যা হয়ে গেছে গেছে । ওই ভয়ে বাইরের ঘরে পড়ে থাকতে হবে না ।

তবু আবার এক একদিন প্রত্যাশা প্রত্যাশা মুখ নিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে আস্তে ঘরে ঢুকে এসে বলে, রাততুপুর অবধি কী এতো লেখো ? লেখা তো কেউ চক্ষু দেখতে পায় না ।...

তারপর রাগ করে চলে আসে দরজাটা খোলা রেখেই ।

আর শক্তিভূষণ (কে জানে নিশ্চিন্ত নিদ্রার শেষে কিনা) ভোরবেলায় উঠে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগেন, গাছে জল ঢালেন গোড়ায় গোড়ায় গোবর সার দেন ।... আর তখন হয়তো শেফালী বিগলিত বিগলিত মুখে বলে, এতোও পারো বটে ! শিথলে কখন ? চিরটাকাল তো আপিসে চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করেই কাটিয়ে এলে ।...

হয়তো এইভাবেই বাকিটা কাল কেটে যেতো শেফালীর । অথবা শক্তিভূষণের । কিন্তু বাইরের পৃথিবী যে আঘাত হেনেই চলেছে । কেউ নিজের মতো করে থাকতে চাইলেই কি থাকতে দেয় পৃথিবী ?

সমীরের দোকানটা এমন জিনিসের যে যখন তখন ঢুকে পড়ার কোনো যুক্তি নেই । তবু ছুতো সৃষ্টি করে ঢুকে পড়ে বিভা । আজ বলে, তোমার এই দোকান কিছু কিছু

স্টেশনারি জিনিস রাখো দিকি তাহলে এসে ঢোকবার একটা মানে দেখানো যায় ।
এখন দোকানে কেউ নেই ।

সমীর কাউন্টারের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে বিভার গোলগাল গালে একটা ছোট্ট
টোকা মেয়ে গলা নামিয়ে বলে, চিরকাল শুধু দোকানেই আসবে ? ঘরে যাবে না ?
যাওয়ানোর গরজ কোথায় তোমার ?

আমি একটা দীনহীন তুচ্ছ দোকানী, আমার গরজ দেখাতে যাবার মুখ কোথায় ?
আমি কী এমন রাজকন্তে ?

ওরে বাবা ! রাজকন্তে কি, সম্রাটকন্তে ! আমি তো রাস্তায় ওনাকে দেখতে পেলে
শত হস্ত দূরে পালাই । যা চাউনি । মাঝুঘের দিকে তাকাচ্ছেন, নাকি নরকের ক্রিমি
কীটের দিকে তাকাচ্ছেন...বোকা যায় না ।

বিভা অভিমান অভিমান গলায় বলে, তাহলেই বোঝো কত স্থখে আছি আমরা ।
তা যেভাবেই হোক, তুমি একবার গিয়ে না বললে ?

ওরে বাবা ! আমার ফাঁসি দিলেও ওকাজ হবে না ।

বেশ ভালো, তাহলে এই অবস্থাই চলুক । অথচ আমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে
ভাব জমিয়ে তালের বড়া খেয়ে এলাম ।

আমার মায়ের কাছে ? সেটা আবার ভারী একটা শক্ত ব্যাপার নাকি ?

সমীর বলে, তুমি যদি আমার মায়ের হাতের ওই তালের বড়ার প্রশংসা করে
আসতে, তাহলে দেখতে নেমস্ত্র চল আসতো । মা বলতো, তোর সেই বন্ধুর
বোনটিকে আর একদিন আসতে বলিসনা রে । বড় খাসা মেয়েটি ।

মায়ের কাছে বাজে কথা ? আমি তোমার বন্ধুর বোন ?

বাঃ নয় কেন ? তোমার দাদার সঙ্গে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলিনি ?

ওঃ তাই বৃষ্টি ? তা দাদাকেই বল ।

পাচ্ছি কোথায় তাকে ? সে তো এখন বিগম্যান । বিদেশ থেকে আসে, বড়লোক
খণ্ডরের বাসায় ওঠে, ট্যাক্সি চড়ে আসে যায় ।

বৌদিটার লাক । আমার এই ভাবেই জীবন যাবে ।

আহা থাক । জীবন একেবারে চলে গেল । একটা কাজ করলে হয়—

কী ?

আমার সেই প্রতুলমামার আর্জিটার ছুতো করে মাসিমার কাছে হানা দিইগে—
সেই সঙ্গে নিজের আর্জিটাও পেশ করে ফেলা যাবে ।

বিভার চোখে মুখে খুশীর ফুল ফোটে ।

পাত্র হিসেবে আহামরি না হলেও, প্রধান ভরসা সমীররা বামুন । পৈতে অবশ্য পরে

না, তবে ‘ভাতুড়ী’ যে ব্রাহ্মণ তা বিভা জানে।

বিভা মনে মনে ভেবে নেয়, সহজে হলো তো হলো নচেৎ নিজেই সে আইন হাতে নেবে। বাবার দয়ার উপর পড়ে থাকলে যে কিছু হবে না, তা সে ভালই জানে। ...ঠিক আছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই সামনে পুষ্পকাকা। বিভার ভাগ্যটা বটে! আর এক মিনিট হলেই পথের চলমান জনশ্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো, ধরতে পারা যেত না, কোথায় ঢুকেছিল বিভা।

পুষ্পকাকা যদি জিগ্যেস করে, এ দোকানে কী দরকার রে? তাহলে কী উত্তর দেবে সেইটাই মনে মনে ভাঁজছিল বিভা, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল পুষ্পভূষণ। বলল, তোদের বাড়ি একবার যাব যাব ভাবছি—তা হয়ে উঠছে না। ইয়ে, মেজদার মনটা একটু নরম হয়েছে?

বিভা থতমত খায়।

এটা আবার কোন প্রশ্ন।

বলে, কিসের?

ওই আর কি তোদের বাড়ি-ফাড়ির কথা বলছি। বাড়ি আর কী? নোনাধরা ইটের স্তূপ বৈ তো নয়। জমিটা নিয়েই কথা। আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোক এই অঞ্চলে জমি জমি করে অস্থির হচ্ছেন। আমায় বলছিলেন, অন্তত কাঠাচারেক জমি পেলেও—তা তোদের বাড়ির সামনের জমিটা বোধহয়—

বিভা কণ্ঠে বেজার গলায় সামলে নিয়ে বলে, তা আমায় বলে কী হবে?

তা জানি। যাব, শক্তিদার কাছেই যাব একদিন। জেনে নিচ্ছিলাম মতি বুদ্ধি একটু ফিরেছে কিনা।

বিভা ফস করে বলে বসে, বাবার? এ জন্মে নয়।

পুষ্পভূষণের মুখে একটা ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে। বলে, সেই তো মজা। সংসারের এই হাল, ছেলেমেয়েদের এই অবস্থা করে রেখেছে, মেজবোদিকে দেখলে তো দুঃখ হয়, অথচ—

বিভা আন্তে বলে, বলে দেখবেন। তবে স্বয়ং ভগবান এসে বোঝালেও কাজ হবে কিনা সন্দেহ।

এই দৃঢ়তাটা যদি সুপথে লাগাতে পারতো মেজদা। ভদ্রলোকের যেমন ঝোঁক দেখলাম, চারকাঠা জমির জন্তে লাখ দুই পর্যন্ত।

সকালে স্নানের পর একটা ভিজ়ে জ্বাকড়া নিয়ে মন্দির মার্জনা করছিলেন শক্তি-

ভূষণ। এটিও তাঁর নিত্যকর্ম পদ্ধতির একটি অঙ্গ। মন্দিরের শান বাঁধানো গায়ে এখন ফাট ধরেছে বিস্তর, জায়গায় জায়গায় আগাছার চারা উকি দেয়। শক্তিভূষণ সেইগুলি উপড়ে উপড়ে তাদের বৃদ্ধিটা বন্ধ রাখেন, আর সকালবেলা সারাদিনের ধুলোটা মুছে পরিষ্কার করেন। শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা চাপিয়ে গন্ধাজল ঢেলে আবার দরজাটা তালো বন্ধ করে রেখে দেন। এখন তালোই দেন, দিনকাল খারাপ, পাঁচিল ভেঙে রাস্তা থেকে এক হয়তো কোনো ছুঁইছেলে ঢুকে পড়ে ঠাকুরটাই নিয়ে পালালো।

বাড়িতে বেল গাছ, বাড়িতেই সামান্য কিছু ফুলটুল, নিয়ম সেবার ক্রটি হয় না। মন্দির মার্জনাতে ঠাকুরের দরজা খুলে, পুজো সেবে এবড়ো-খেবড়ো জমি পার হয়ে দাওয়ায় উঠে এলেন। ফাটা চটা সীমেন্টের চাকলা ওঠা ঢাকা দাওয়ায় আত্মিকাল থেকে পড়ে থাকা চোঁকিটায় বসলেন। তৃপ্ত প্রসন্নমুখ, ভাঙাচোরার কুশ্রীতা চোখে ঠেকে না। চির-অভ্যস্ত দৃশ্যের খাঁজে নিজেকে বসিয়ে নিয়ে শান্ত চোখে তাকান চারদিকে। সব ঠিক আছে, অবিকল অপরিবর্তিত। জন্মাবধি যেমন দেখে আসছেন। ফাটা চটা খাপরি ওঠাই তো দেখে আসছেন জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত। হয়তো আরও কিছু ভেঙেছে, আরো কিছু চাপড়া খসেছে। দেয়ালের নোনাধরা ইঁট থেকে অবিরত বরঝরিয়ে গুড়ো বরতে বরতে হয়তো আরো অনেক ইঁট গভীর পর্যন্ত থেয়ে গেছে, তবু পরিতৃপ্তির অস্থবিধে কোথায়?...এই তো চৌকীর একটা ধারের দিকে জল ছিটিয়ে মুছে জল খাবার এনে নামিয়েছে শেফালী, ফুল-কাঁসার রেকাবে কয়েক টুকরো কাটা পেঁপে, কয়েক টুকরো পাকা পেয়ারা, দুখানা পরোটা, এতটু আলু চচ্চড়ি।

ফল দুটো বাড়ির গাছের, দাম লাগে নি।

পিছন উঠোনের কোণে একটা কলাগাছে 'কাঁদি' পড়েছে। কড়ে আঙ্গুলের মত ছোট ছোট কলা, তা হোক, ভিটের মাটির রসে পুষ্ট। ক'দিন পরেই কাঁদিটা নামানো যাবে।

রেকাবিটা টেনে নিলেন শক্তিভূষণ।

ঠিক যেমন ভাবে টেনে নিতেন বড় জ্যাঠামশাই। তিনিও ঠিক এইখানে বসে এই রকম বেলায় প্রাতরাশ গ্রহণ করতেন।...এই রকম ফুল-কাঁসার রেকাবে কাটা ফল গরম পরোটা আলুবড়ি, বাড়তির মধ্যে একটু করে মাখন মিশ্রী। বিহ্বল একটা বালক সেই রাজকীয় ভোগের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিঃশ্বাস ফেলতো।... ছোটছেলেদের ব্যবস্থা আলাদা ছিল। তাদের জন্মে পেতলের ঘড়া থেকে বাটিতে বাটিতে মুড়ি ঢালা হতো, তার সঙ্গে একটু করে গুড়। কদাচ নাড়ু-টাড়ু।

হু বেলাই ভাতের পাট। ‘রেশন’ শব্দটা তখনকার অভিধানে ছিল না, আটা মেখে মেখে রুটি বানাবার শখও কারো ছিল না। কেবলমাত্র জ্যাঠামশাইয়ের জন্তে রুটি রান্না হতো, তার দরুণ দু’চারখানা বাসি যা থাকতো তাঁটুদাসকালে মেয়ে দিতো। জ্যাঠামশাইয়ের জীবনটাই দেখেছেন শক্তিভূষণ, বাবারটা নয়। তাই তাঁর আচরণে বংশের ধারার যে ছাপটা ফুটে ওঠে, সেটা সেই জ্যাঠামশাইয়ের মতই। এই ভাবেই চৌকিতে বসে পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে জলখাবারটি খেতেন জ্যাঠামশাই। ওই ঘের প্রাচীরের বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়েও দেখতেন না। যদিও তখনই ভটচার্জি বংশের শিকড় হেঁড়া শুরু হয়ে গেছে।

পুষ্পভূষণ তাঁর মেজ জ্যাঠামশাইয়ের ছোট ছেলে—যে জ্যাঠামশাই বরাবর বাইরে বাইরে কাজ করেছেন। ওরা ওদের ভিটের ভাগ ছেড়ে দিয়ে জমির অংশ নিয়ে ফলাও কারবার করে নিয়েছে।

গাছের পেঁপে মিষ্টির বালাই নেই কাঁচাটে, তবু পরম পরিতৃপ্তিতে কামড় দিচ্ছিলেন শক্তিভূষণ, ভেজানো সদর ঠেলে ঢুকল পুষ্পভূষণ। কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত মুখ।

শক্তিভূষণ হৈ চৈ করে উঠলেন না। শান্তভাবে বললেন, এসো। বসো। সব ভালো তো ?

বসবার জায়গা বলতে আলাদা কিছু নেই এখানে। কোনখানেই বা আছে ? এই চৌকিটাই শুধু। শক্তিভূষণ পুষ্পভূষণের সোফা সেটি মাজানো ডুইংরুমের চেহারাটা স্মরণ করলেন না, বললেন বোসো। বসল পুষ্পভূষণ।

আলগা আলগা দুটো কথা বলল, তারপর আসল কথাটায় এলো। সেই বন্ধুর স্বপ্নের আবেদন। যে রকম ঝাঁক চেপেছে টাকায় কার্পণ্য করবে না।

শক্তিভূষণ শান্তভাবেই সবটা শুনে বললেন, তোমার তো অনেক রকম বিজনেস। আজকাল কি আবার জমির দালালীও শুরু করেছ ?

শেফালী পুষ্পকে দেখে হু পেয়লা চা নিয়ে আসছিল, ঠোঁকর খেল ঘরের চৌকাঠে। একেই তো উপকরণবিহীন শুধু চা ; নেহাৎ শান্তির বিয়েয় পাওয়া দুটো চায়ের কাপ শান্তির বউ রেখে গেছে, তাই কেউ এলে গেলেকাজে লাগে। তা যাই হোক, অমন মান্তিমান লোকটাকে কীভাবে কথা বলা !

তাড়াতাড়ি কাপ দুটো নামিয়ে দিয়ে শেফালী বলে ওঠে, এ আবার কি কথার ছিঁরি তোমার ? একটা হিত পরামর্শ দিতে এসেছেন ঠাকুরপো—

হিত পরামর্শ ? তা বটে !

শক্তিভূষণ বক্সি হাসি হেসে বলেন, কথামালার গল্পের সেই ল্যাজকাটা শেয়ালটি সব শেয়ালকেই হিত পরামর্শ দিয়েছিল !...এ কী আমায় আবার শৌখিনপেন্ডালায়

চা কেন ? আমার কাচের গেলাসটা কোথায় গেল ? নাও সরাও, ও তোমার ঠাকুর-
পোকে দাও ।

আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায় পুষ্পভূষণ ।

বলে, চা থাক মেজ বউদি । এইমাত্র খেয়েই আসছি । তবে একটা কথা জেনে
রেখো মেজদা, অপরকে অহেতুক অপমান করলেই নিজের মান বাড়ে না । আচ্ছা !

উঠোনে নেমে সদর দিয়ে বেরিয়ে যায় ।

ওর এই আচ্ছার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্পর্কচ্ছেদের ইশারা ।

পুষ্পভূষণ চলে যাওয়া মাত্রই শেফালী চৈঁচিয়ে ওঠে, হল তো ? হল ? খুব মান
বাড়ল ? ও জমির দালালী করে তোমার কাছে পয়সা খেতে এসেছিল, না ?...
রাতদিন এ সংসারে হাড়ির হাল দেখছে, তাই স্থপরামর্শই দিতে এসেছিল । ঘোচালে
তো সম্পর্কটা ? নিকট বলতে ওরাই ছিল কাছাকাছি ।

শক্তিভূষণ বললেন, কাছাকাছি থাকলেই কি কাচের মাছুষ হয় ? কী হলো আমার
কাচের গেলাস ?

পেয়ালায় ঢেলেছি আবার গেলাসে ঢালাঢালি করতে যাব ?

কষ্ট হয় তো থাক । একদিন চা-টা বাদ গেলে কিছু এসে যাবে না ।

বাদ যাবে ? ওঃ !

শেফালী প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে চলে যায় ।

এই সময় হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে দীপ্তিভূষণ ! দীপ্তিভূষণের সর্বাবয়বে
এমন একটি মাজা-ঘষা ছাপ যে মনে হচ্ছে ও এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে । দীপ্তি-
ভূষণের কণ্ঠস্বরেও সেই মাজা-ঘষার ছাপ ।

বলল, একদিন কাপে চা খেলে কী হয় ।

শক্তিভূষণ ভাবেন নি, এভাবে একটা আক্রমণাত্মক কথা বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে
এসেছে দীপু । কিন্তু তিনি তো আর ঘাবড়াবার ছেলে নয় । বললেন, এ প্রশ্নটা
করবার জন্তে এতো কষ্ট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ? কিন্তু ওটা আমার নেহাৎই
ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কি ?

কাচের গেলাসে চা-টা ঢেলে এনে চোরের মতো এক পাশে দাঁড়াল শেফালী । দীপু
মুখের ভাব ভাল নয় । বাপে ছেলেতে একটা কিছু না বেধে যায় । শেফালীর হয়েছে
শাঁখের করাত । ইচ্ছে হয় ছেলেরা শক্তিভূষণের মুখের উপর গায়া কথা শুনিতে দিক
পটাঁপট, কিন্তু সেই বলার উপক্রম দেখলেই শেফালীর ভয়ে বুক কাঁপে ।

শেফালী দেখল, দীপু ঠোঁটটা কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, ও
নিয়ে বলার কিছু নেই । আপনার নীচতা দেখতে দেখতে এক এক সময় অসহ

লাগে, তাই না বলে পারা যায় না।

কী ? কী বললে ? আমার নীচতা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ! তাই। আপনার—

দীপুর গলায় একটা ভয়ঙ্কর সুর বলসায়, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা অত্যাচার !
দেখে দেখে নিজেকে এ বাড়ির ছেলে ভাবতে ঘুণায় লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কাকে কি বলছিস দীপু ?

শেফালী ব্যাকুল হয়ে ছেলের পিঠে হাত ঠেকায়। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে, হঠাৎ কী হলো
তোর ?

দীপু ঝটকা মেরে মায়ের হাতটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বলে, যাকে যা বলবার
ঠিকই বলছি ! হঠাৎ নয় সারা জীবনের প্রতিবাদ, একদিন বাস্ট করেই। তোমার
ওপরও আমার কিছু সহানুভূতি নেই মা। অবিরত নীরবে সহ করে করে তুমি
একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকের অত্যাচারের স্পৃহাটা বাড়িয়েই চলে চলে শুধু
নিজেরই ক্ষতি করনি, আমাদেরও জীবন ধ্বংস করেছে।

শেফালী সামনে বসে থাকা পাথর সদৃশ লোকটার দিকে তাকাতে সাহস পায় না,
না তাকিয়ে বলে, নীরবে সহ করি আমি ? আজীবনই তো ওই মাল্লবের জেদ আর
খামখেয়ালে জবাই হচ্ছে। তবু চুপ করে সইছি ? দেখতে পাস না রাতদিন
চোঁচাচ্ছি।

খামো ! ও চোঁচানোর কী মূল্য হলো, এই আমি আজ আপনার মুখে স্পষ্ট জানতে
চাই কেন আপনি ভাববেন পৃথিবীতে মাল্লব একমাত্র আপনি, আর সবাই কুকুর
বেড়াল।

শক্তিবৃষ্ণ বিচলিত হলো না।

শুধু ভুরু কঁচকে বলেন, এই কথা ভাবি আমি ?

আলবাৎ ভাবেন। মনে করেন যা কিছু মান সম্মান শুধু আপনারই আছে, আর
কারো মান নেই, আত্মসম্মান নেই। যারা আপনার হাতে আছে, আপনি তাদের
সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করবেন। করেনও তাই।

আমি তোমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করি ? না তোমরাই আমার সঙ্গে
চাকর বাকরের মত ব্যবহার কর বাবা !

খামুন। বুঝে স্বপ্নে ইয়ে সাজবেন না। উপায় থাকতেও আপনি আমাদের ভিখিরি
করে রেখেছেন। লোকের কাছে আমাদের আহান্নুখ বানিয়ে রেখে দিয়েছেন।
আমাদেরও যে একটা জীবন আছে একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। তা কোনোদিন
স্বীকার করেছেন ? আপনি নিজের অহংকারের গজদন্ত মিনারে বসে থেকে আমাদের

দুর্দশা উপভোগ করছেন, আর প্রতিক্ষণ আমাদের অপমান করবার চেষ্টা করছেন। শেফালী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার বরাবরের স্বপ্নভাবী এই ছেলের দিকে। এতো কথা কার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে? দীপুর? এ কোন দীপু? দীপু তার বাপকে অবজ্ঞা করে, হয়তো ঘৃণাও করে তা জানে শেফালী, কিন্তু এতো সাহস হল কী করে? ভীৰু শেফালী সাহস দেখলে ভয় পায়, অবাক হয়।

কিন্তু শক্তিভূষণ?

তিনি কি তাঁর ছেলের এই অবিস্বাস্ত স্পর্ধায় বিচলিত হন? তিনি কি টেচিয়ে ওঠেন?

নাঃ। অবিচল শক্তিভূষণ অটুট গলায় বলেন, নাটকের যে যে ডায়ালগগুলো মুখস্থ করে এসেছিলে, সব বলা হয়েছে? না আরো কিছু বাকি আছে? থাকে তো বলে যাও।

নাটকের ডায়ালগ।

মুখস্থ!

দীপ্তিভূষণ ব্যঙ্গ তির্যক গলায় বলে, চমৎকার। তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন। সারা জীবন তো এই চর্চাই করেছেন। কিসে অন্তকে আঘাত দেওয়া যায়। এতে শুধু চরিত্রের নীচতাই প্রকাশ পায় বুঝলেন? নীচতা নোংরামি, ভণ্ডামি। ছেলে-বেলা ত্যাগ বিলাসিতা বর্জন, লোভ শূন্যতা অনেক বড় বড় বুলি শুনিয়েছেন আপনি আমাদের। সে মুখোঁস খুলে গেছে বুঝলেন?

গেছে বুঝি?

শক্তিভূষণ তেমনি অটুট গলায় বলেন, তা হলে তো বোলাই চুকেই গেছে।

চুকে গেছে বললেই চুকে যায় না।

দীপ্তিভূষণ ত্রাজে চাপ পড়া ক্রুদ্ধ অজগরের মত গর্জন করে বলে ওঠে, এতোই যখন ত্যাগের আদর্শবাদ, তখন সংসার করা উচিত হয়নি আপনার। খুশীতে আধ ডজন জীব সৃষ্টি করে বসে—

এখন শক্তিভূষণ উঠে দাঁড়ান।

দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে পাথুরে গলায় বলেন, অনেকক্ষণ বলতে দেওয়া হয়েছে তোমায়, এখন যেতে পারো। না না পরে নয়, যাও। আর কখনো এ দরজা ডিঙো-বার চেষ্টা করো না বুঝলে? মনে থাকবে?

ঠিক আছে!

বলে তরতর করে সিঁড়ি কটা নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যায় দীপু।

শেফালী এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে থেকে টেচিয়ে কেঁদে ওঠে, তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে?

জন্মের শোধ তাড়িয়ে দিলে ?

হ্যাঁ দিলাম ।

শক্তিভূষণ জ্বায়াস্ব গলায় বলেন, দেহের কোনো অংশে দুঃস্থ ক্ষত হলে, সে অংশটা বাদ দেওয়াই বুদ্ধির কাজ ।

অতএব বুদ্ধির কাজই করে চলেন শক্তিভূষণ ।

করেন, ক’দিন পরেই, আরও একবার ।

শক্তিভূষণকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে দোকানী সমীর ভাড়াটী সাহস সঞ্চয় করে বাইশ নম্বর বাড়িতে ঢুকে আসে । বলাই ছিল, অতএব ঢুকেই বিভাকে দেখতে পায় ।

বিভার মুখে আহ্লাদ !

বিভার চোখে কটাক্ষ ।

বিভার বুকে আবেগ ।

সমীর সেই আবেগ আহ্লাদ কটাক্ষের দিকে তাকিয়ে বলে, উঃ ! কখন থেকে যে চেষ্টা করছি । সন্ধ্যা আর দুর্গ ত্যাগ করেনই না । রাস্তা দেখছেন, লোক দেখছেন, থামছেন এগোচ্ছেন । ব্যাপার বুঝলাম না !

বাবার তো ওই রকমই ।

বিভা বলে, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একশোবার বাড়ির বাইরের ওই পাঁচিলটাকে দেখবেন, আর দাঁড়াবেন । দেখে আর ফুরোয় না ।

তা এতই যদি ‘বাড়িপ্রেম’, সারান না কেন বাবা ?

এই বাড়ি সারানো ?

বিভা ভ্রমস্বী করে, নতুন চাকরী হতেই দাদা একবার একটা কন্সট্রাক্টরকে ভেকে এনে এস্টিমেট চেয়েছিলেন, লোকটা হেসেছিল । বলেছিল, এ বাড়ি সারানো যায় না । তবে তেমন খেয়াল হলে হাজার চল্লিশ পঞ্চাশ লাগবে । বাবা শুনে ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বলেছিল, আচ্ছা বলুন তো মশাই, যেমন আছে রেখে দিলে ছুমিসাৎ হতে কত বছর লাগবে ?

লোকটা বলল, তা কী বলা যায় ? পুরনো বাড়ির খেয়াল । হয়তো দুটো বর্ষাতেই ধরবে যেতে পারে । তবে একতলা বাড়ি তো, আছে তো আছেই । নানা ধরবে ইঁট খসবে ফাটল ধরবে গাছ গজাবে তবুও বছর পনের বিশ টিকেও থাকবে । ...শুনে বাবা একগালহেসে বলল, পনের বিশ ! ওতেই হবে । ওতেই হবে । ...বাবার মুখের অমন প্রাণখোলা হাসি দেখিনি কখনো ।

তার মানে, উনি গুঁর জীবদ্দশায় এ অবস্থার বদল করবেন না ।

বিভা করুণ মুখে বলে, তাই তো মনে হয় । কিন্তু এতো কষ্ট লাগে মাকে দেখলে !
সারা জীবন শুধু—যাক মাকে বলে রেখেছি, চলো এই বেলা ।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো । হঠাৎ আবার কখন আলমগীরের অবির্ভাব ঘটবে, সঙ্গে সঙ্গেই
তো বান্দার বিদায় মুহূর্ত ।

বিভা বলে, বেশ তো বলছো । কাজটা তা হলে এগোবে কী করে ?

আরে বাবা, মা জননীকে দিয়ে থানিকটা এগোনো যাক তো, পরে দেখা যাবে ।

প্রথমটা অবশ্য ‘প্রভাস মামার’ আর্জিটাই পেশ করে সমীর । সেই জমির ব্যাপার ।

শেফালী হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ও আশা আর করি না বাবা । ওই মাহুঘের
মাথায় যে কী খেয়াল ঢুকে বসে আছে । সেদিন তো ওনার একতাই, এই তো
এই পাশের ম্যানসনের মালিক পুষ্পভূষণবাবু, এই কথাই বলতে এসেছিল, তাকে
তো এক রকম অপমান করেই তাঁড়িয়ে দিলেন ।

সবই জানে সমীর, তবু বলে, আপত্তিটা কি ?

ওই তো ভিটে বেচবো না ।

তা ভিটে বাড়িটা থাক না, আশপাশের জমিটা দিতে কী ? সামনে পিছনে অনেকটা
তো জায়গা !

বলা বৃথা বাবা ।

সেদিন একটা দালাল এসে পিছনের জায়গা থেকে এক দেড় কাঠার জুইঝুইঝুই
করল, ও চলাফেলা গত হয়ে পড়ে রয়েছে, তাতেই পঁচিশ-তিরিশ হাজার দিতে চাইল,
প্রায় দূর দূর করেই তাঁড়িয়ে দিলেন তাকে ।

সমীর হেসে ফেলে বলে, তা হলে তো চলবেই না ওকথা । কিন্তু আমার নিজেরও
যে একটা আর্জি ছিল মাসিমা । তাতেও দূর দূর হতে হবে না তো ?

এই দ্বিতীয় কথাটা বলে রাখেনি বিভা । শুধু সমীরের নতুন মামার গল্পই শুনিয়ে
রেখেছিল । বলেনি ভয়ে । যদি মা-ই নাকচ করে দেয় ?

শেফালী অতএব অবাক হয় ।

তোমার কী ?

কী সেটা ধাঁ করে বলে ফেলে সমীর ।

মেয়ের তো বিয়ের বয়স হয়েছে, কী রকম পাত্র খুঁজছেন ? খুব দামী ? না মোটামুটি
হলে চলবে ?

শেফালী কপালে হাত দিয়ে বলেন, খুব ভালো ! হায় কপাল । খুঁজছেই বা কে
পাস্তর ? ওই তো মাহুঘ, ডাঁটের ওপর আছেন পণ-টন দেবেন না—আজকের

বাজারে এ জেদ রাখলে চলে ?

সমীর অমায়িক মুখে বলে, চলবে না কেন ? সকলেই কিছু পণ চায় না । আমার হাতেই একটি অবশ্য মোটামুটিই পাত্র আছে, এক পয়সাও দাবি নেই, শুধু মেয়েটি হলেই হলো ।

শেফালী বিগলিত গলায় বলে, সত্যি বলছ ? কোথায় কী বৃত্তান্ত আমায় বলে যাও তা হলে—

বিভা জানে, ও বলে দেবে । আমি পালাই । মেসোমশাই এসে যাবেন, ওঁকে দেখলে আমার ভয় করে ।

সমীর চলে যেতেই শেফালী অবোধের ভান ত্যাগ করে বলে, এই ছেলেটার সঙ্গেই তা হলে ভাব ভালবাসা চালানো হচ্ছিল ? আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি ! তা কী জাত ও ?

ব্রাহ্মণ ! ভালো ব্রাহ্মণ !

শেফালী হুটুই হয় ।

এক পয়সা দাবি নেই । এটা বোধহয় লওয়াতে পারবেন শক্তিভূষণকে । তাই একটু নিভৃতি খুঁজে পাড়লেন কথাটা ।

দেখতে শুনতে ভালো, কাজকর্ম করে, দাবি-দাওয়া কিছু নেই—

শক্তিভূষণ ভুঁরু কুঁচকে বললেন, এতো সব সন্ধান হুলুক দিচ্ছে কে ? ঘটক লাগিয়েছ নাকি ?

শোনো কথা ! আমি আবার তোমার অজান্তে কী করছি ? এর ওর মুখে শুনলুম—

শক্তিভূষণ বললেন, তোমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে এ ও সে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে তা হলে ? তা ভালো ! যাক, কী জাত ? মুচি, মুসলমান ? হাড়ি ? ডোম ?

মরি মরি ! কী কথার ছিঁরি । আমি যেন তাই বলতে আসছি তোমায় । সদ্বানুনের ঘরেরই ছেলে । বাপের নাম ছিল রাজীব মৈত্র, কোটে না কোথায় কাজ করতো, মারা গেছে ক' বছর । ছেলের নাম—

শক্তিভূষণ কাটারী নিয়ে একটা বাথারি টাচছিলেন, হাত ধামিয়েছিলেন, আবার সে কাজে মন দিয়ে বলেন, মৈত্র ? ওদের সঙ্গে আমাদের চলে না ।

শেফালী রেগে ওঠে ।

কেন, চলবে না কেন ? মৈত্র বামুন নয় ?

বামুন নয়, তা তো বলিনি । বলছি—ওদের সঙ্গে আমাদের চলে না ।

এখন আবার অত চল অচল লোকে মানে না কি ?

লোকে কী করে না করে আমার জানা নেই । আমি মানি ।

বললেন শক্তিভূষণ ।

আর এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের আর একটা দৃষ্টকৃত্যুৎক অংশ প্রকাশ পেয়ে গেল এবং বোঝা গেল জায়গাটা যেমন নিভৃত মনে হয়েছিল তেমন ছিল না । কিন্তু বিভা নামের ওই সর্বসাধ আত্মলাদ বর্জিত মেয়েটা আর কত সহ্য করবে । দিদি ছিল একটা মনের সঙ্গী, চিরনির্বাসন ঘটেছে তার এ বাড়ি থেকে, মেজদার সঙ্গে তেমন যোগ না থাক তবু মেজদা ছিল ! তার আসা যাওয়া চলাফেরা সবার মধ্যেই যেন একটা মহিমা মহিমা ভাব ছিল, তাকেও গোট আউট করে দিয়েছে বাবা । দাদার কথা তো বাদই দাও । থাকা না থাকা সমান ।

বিভার তবে ভবিষ্যৎ কী ?

বিভা যদি হাতের কাছে আসা নৌকোখানা বোকার মত জলে ভেসে যেতে দেয়, আর নৌকো জুটবে তার ?

বিভাকে অতএব কোনো একখান থেকে বেরিয়ে এসে বলতে হয়েছে, আপনি অনেক কিছুই মানেন বাবা, মানেন না শুধু আপনার ছেলে মেয়েদেরও একটা মন প্রাণ আছে । যাক—মা, জিজ্ঞেস কর তো বাবাকে বাবার উচ্চকুলের সঙ্গে মেলে এমন উচ্চ ব্রাহ্মণের ঘরের কোনো পাত্র উনি গুঁর মেয়ের জন্তে ঠিক করে রেখেছেন কিনা ।

অতএব শরীরের ক্ষতদৃষ্ট অংশকে ত্যাগ করলেন শক্তিভূষণ ।

বললেন, মেয়ে সন্তান একবস্ত্রে রাস্তায় বার করে দিলে নিজেরই অপমান । তিন দিন সময় দিলাম আমি, এর মধ্যে যা ব্যবস্থা করবার করে নাও । মনে রেখো তিন দিন পরে এই বাইশ নম্বর বাড়িতে আর এক ঘণ্টাও নয় ।

এবার আর কেঁদে উঠলো না শেফালী ।

শুধু ভয়ানক একটা শূন্য গলায় বলল, একে একে তা হলে সবাইকেই তাড়াবে তুমি ?

দরকার হলে করতাই হবে তা ।

তবে দাও, আমাকেও তাড়িয়ে দাও । আমি আর এই শূন্য প্রেতপুরীতে টিকতে পারবো না ।

না পারো অনায়াসে কোনো পুণ্য পুরীতে চলে যেতে পারো । ভাইয়ের বাড়ি আছে, ছেলের বাড়ি আছে ।

এর পর আর কোন্ অভিমানের কান্না কাঁদতে যাবে শেফালী ?

শেফালী অতএব যথারীতি সকালে উঠে দেওয়ালের কোলে কোলে ঝরে পড়া ইটের নোনা কাঁট দিয়ে দিয়ে এই বৃহৎ বাড়িটা পরিষ্কার করছে, কয়লা ভাঙছে কাঠ

কাটছে উল্লুখ ধরাচ্ছে রান্না চাপাচ্ছে । শুধু উল্লুখটা ধরাবার সময় ‘বড়টা আর কী হবে’, বলে ছোট উল্লুখটা ধরাচ্ছে । আর বড় হাঁড়িটা সরিয়ে রেখে ছোট হাঁড়িটায় ভাত চাপাচ্ছে ।

কিন্তু ছোটটাও যে বড় হয়ে দাঁড়াবে, তা কি ভেবেছিল শেফালী ? ভেবেছিল কি তিপু নামের সাদাসিধে ছেলেটার মধ্যেও এতো দুষ্টিমি ঢুকে বসেছিল ?

মেজদার জামা প্যান্ট ভরা স্টকেসটা, আর মায়ের গলার হার এবং বাবার বাক্সের কিছু টাকা হাতিয়ে কেটে পড়বে সে ভাগায়েষণে ? চিঠি লিখে রেখে গেছে খুঁজতে বারণ করে । লিখেছে—বাবা তাঁর ভিটের মাটি কামড়ে পড়ে থাকুন, তাঁর উপর আর কোনো আশা রাখি না । মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তো এসে সব ঋণ শোধ দেব । না ফিরি, মনে কোরো বাইরের চোর চুরি করে নিয়ে গেছে ।

শেফালী কোনো কথা বলেনি, চিঠিটা শক্তিভূষণের সামনে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল ।

একটু পরে শক্তিভূষণ প্রায় কখনো যা করেন নি, তাই করলেন । চিঠিটায় চোখ বুলোতে বুলোতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, শেফালী দেবীর বি এ পাশ মেজছেলের থেকে স্কুল ফাইনাল ফেল কর্নিষ্ঠ পুত্রটি তো দেখছি অনেক চালাক ! আখের গুছোবার বুদ্ধি আছে ।

শেফালী কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে যাওয়া চোখ দুটো তুলে বলে, তোমার প্রাণটা রক্ত-মাংসের না লোহার ?

বোধহয় তাই ।

শক্তিভূষণ বলেন, ভয় নেই, এই আখের গোছানোরা সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় না । দেখো—দু’দিন পরেই এই পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে রান্নাঘরে এসে পিঁড়ি পেতে বসে যাবে । মাতৃস্নেহের বহরটা তো জানে ।

শেফালী এখন ভগবানের কাছে কোন্ প্রার্থনা করবে ? ওই চণ্ডালচিত্ত লোকটার মুখ মাথা হেঁট করতে জীবনে না ফিরে আসুক তিপু । না কি প্রার্থনা করবে, ‘হে ঠাকুর ওর কথাই যেন সত্যি হয় ?

ঠিক করতে পারে না শেফালী তাই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলে, একটা পিশাচের সঙ্গে ঘর করে এলাম আমি চিরদিন । একটা পিশাচের সঙ্গে ।

শক্তিভূষণ বললেন, সে তো চিরকালই জানছো । তবে একটু সামলে নিয়ে দেখো, বাছাধন আর কী কী হাতিয়ে নিয়ে কেটেছেন ।

শেফালী মনে মনে বলে, বোকা ! বোকা ! পয়লা নম্বরের বোকা একটা ! আমার পেটের সন্তান তো, আর কত বুদ্ধি হবে ? কী দরকার ছিল তোর চিঠিতে কবুল

করবার, মা ট্রাক থেকে তোমার হারটা নিয়ে যাচ্ছি। আমি কি ওই নির্দয়কে বলতে যেতুম। তুই আসিসনে, আসিসনে, ওর উচু নাক ভোঁতা হোক !

আবার শেফালী প্রতি মুহুর্তে কান খাড়া করে থাকে, রান্নাঘরের পিছনের উঠানের ছোট দরজাটায় ঢোকা পড়ার শব্দ হল কি না। তপু ওর বন্ধু ছিল, ওকে হয়তো কিছু বলে গেছে। কিন্তু যাবে কী করে ? ওই দান্তিক মানুষটা কি তাহলে আস্ত রাখবে শেফালীকে ? মাতৃহৃদয়ে, হাহাকার বুঝবে না, মান খেঁওয়ানোর অপমানটা বুঝবে।

শান্তিভূষণকে কেউ খবর দেয়নি, তবু বাতাসে বার্তা রটে। চলে এলো একদিন। মায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, তিপু না কি চলে গেছে বাড়ি থেকে ?

শেফালী দুটো হাঁটু উচু করে বসেছিল, তার মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু শক্তিভূষণও যে শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ভিতর বাড়িতে ঢুকে এসেছেন। তিনি বলে ওঠেন, হ্যাঁ কিছু হাতিয়ে-টাতিয়ে ঘটা করে চিঠি লিখে চলে গেছেন। কিন্তু তুমি থামবে ? একটা চোর ছেলের জন্তে, একটা বেহেড মেয়ের জন্যে রাত দিন প্যান-প্যানানি। অসহ্য। তোমার মেজ বোনটিও যে একটা লাভার জুটিয়ে পথ দেখেছেন শোন নি ?

শুনেছে সবই শান্তিভূষণ !

পুষ্প কাকার সঙ্গে তার কোনো কোনো বিজনেস জনিত যোগাযোগ আছে। শুকনো গলায় বলে, শুনেছি ইলেকট্রিকের দোকানের সমীরকে বিয়ে করেছে। চিনতাম ছেলেটাকে।

বিয়ে ! তা হবে।

শক্তিভূষণ বলেন, গল্প জানতো, খড়িগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছি বলে দু বাছ তুলে আহ্লাদ ? এও তাই ! ভাবো বোনের বিয়ে হয়েছে। আমার মতে এ হচ্ছে কুল-ত্যাগ, বুঝলে ? কুলত্যাগ।

শান্তিভূষণ একথার আর কী উত্তর দেবে ? মনে মনে বলে তুমি যদি দুই চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে সূর্যকে অস্বীকার কর, সূর্যের কিছুই এসে যাবে না। সমাজ কোথায় দৌড় দিচ্ছে তাকিয়ে দেখছ না, দুশো বছরের পুরনো ইটের খাঁচার মধ্যে বসে কোন্ কালে শেখা 'হরেকেষ্ট' বুলি আওড়াচ্ছে।

মনের কথা মন থেকে আপনি বেরোয় না এই রক্কে। একটুক্কণ চূপ করে থেকে বলে, দীপুও তো আজকাল আর এখানে থাকে না ?

'থাকে না' নয়, তাড়িয়ে দিয়েছি। ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছি।

শেফালী ছেলের জন্যে চা তৈরী করতে উঠে যাচ্ছিল, তীব্র গলায় বলে গেল,

বাহাদুরীটা ফলাও করে বল বসে বসে ।

শান্তিভূষণ দুঃখের গলায় বলে, অদ্ভুত এক আদর্শ আদর্শ করে নিজেও কোনোদিন
স্ব্থ পেলেন না, অত্বেও কোনোদিন স্ব্থ পেতে দিলেন না ।

শক্তিভূষণ বসেছিলেন চোঁকিতে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ‘স্ব্থ পেলাম না’ এটা
কী করে জেনে ফেললে ?

শান্তিভূষণ একটু খামল, একটু হাসল ।

সেও এখন মস্তবড় হয়ে গেছে, অস্বস্থ হতে শিখেছে । আর সে স্থির করে এসেছে
বাবার ইচ্ছাকৃত অপমান গায়ে মাখবে না । তাই হেসে বলে, জেনে ফেলিনি,
ধারণা মাত্র । অত্বে যে পেতে দিলেন না সেটা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারেন
না ?

শক্তিভূষণ শান্ত গলায় বললেন, আমার সাত পুরুষের ভিটেমাটি বেচে অত্বে বিলা-
গিতার খরচ জোগাতে না পারাটা যদি তাদের অস্ব্থী করা হয় তা করেছি অবশ্যই ।
শেফালী চা নিয়ে এসে নামাল ।

শুনল কথাটা ।

বলল, বিলাসিতা ? তা বলবে একদিনের জন্তে দুটো ভালো খেতে পর্যন্ত—

চুপ করে গেল ।

শক্ত হয়ে বসল শান্তিভূষণ ।

অথচ শান্ত গলায় বলল, আপনি আমাদের যতই অগ্রাহ্য করুন, আমি আপনার বড়
ছেলে, আমার কথাটা একটু শোনবার চেষ্টা করবেন । আমি বলছি এখনো জমির
দর চড়চড়িয়ে চড়েছে, কিন্তু বরাবর একরকম যায় না । পিছন দিকে দু তিন কাঠা
নিজেদের মতো রেখে—

শক্তিভূষণও গম্ভীর গলায় বললেন, সামনেটা বেচে দেবো ? আর এই মন্দির ?

শান্তিভূষণ ওই মন্দিরের দিকে একটু অবহেলায় দৃষ্টিপাত করে বলে, মন্দিরের যা
অবস্থা, তাতে তো—বেশ তো পিছন দিকে না হয় আর একটা ভালো করে বানিয়ে
নেবেন । টাকার অস্ববিধে না থাকলে আর—

শক্তিভূষণ তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলেন, তুমি তোমার এই ভাঙাচোরা মাটিকে কেলে
দিয়ে আর একটি নতুন মা বানিয়ে নিতে পারো ?

শান্তিভূষণ আহত গলায় বলে, আপনি তো সকলকে আঘাত করতেই বদ্ধপরিকর ।
এটাই আপনার আদর্শ । চিরদিন যুতের মর্বাদা দিতে গিয়ে জীবিতদের তাকিয়ে
দেখলেন না । কিন্তু আমি বলব, ওসব ভক্তিতত্ত্ব সত্যি নয় । আসলে আপনি চির-
দিন শুধু নিজেকেই ভালবেসেছেন ।...

আরে কথাটা তোমার মেজ ভাইয়ের কাছে শিখে এলে নাকি ?

শক্তিভূষণ হেসে ওঠেন, সে একটা ফচকে ছেলে, আর তুমি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি—
সত্যি কথা কারুর কাছে শিখতে হয় না বাবা। চিরদিন আপনি যে অগ্রায় করে
এসেছেন—

চিরদিন আমি অগ্রায় করে এসেছি ?

করেছেন কিনা নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন। তবু বলছি—এখনো সময় আছে।
এখনো যদি—

শান্তি, তোমার বোধহয় ট্রেনের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

শান্তি আরক্ত মুখে বলে, সেটা আমি বুঝবো বাবা ! তবে এততেও আপনার শিক্ষা
হল না, এই আশ্চর্য।

শান্তি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—বসে বসে একটা ঘুঘুখোর বাজে লোকের এতো
বাচালতা শোনবার ধৈর্য আমার নেই।

শরীরের আর একটা ক্ষততৃষ্ট অঙ্গ কেটে বাদ দেন শক্তিভূষণ।

ওঃ ! আচ্ছা।

শান্তি উঠে দাঁড়ায়।

তার মানে শেফালীর পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও সরে যাচ্ছে। শেফালীর মাথার
ওপরকার ছাদ ভূমিকম্পে নেমে আসছে। শেফালী চোঁচিয়ে উঠে বলে, শান্তি বুঝতে
পারছিস না, ও পাগল হয়ে গেছে। পাগলটাকে বেঁধে রেখে তোরা যা ভালো বুঝিস
কর। আর সন্থ করতে পারছি না আমি। আমি তোরা মা আমিও গুরুজন, আমি
বলছি ওকে গারদে দে।

শান্তিভূষণ কিছু বলে না।

আস্তে খুলে রাখা জামাটা গায়ে পরে নেয়। জুতোটা পায়ের গলায়, শেফালী ছুটে এসে
ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, তবু তুই আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। আমি চলে যাব,
আমি চলে যাব। আমি আর পারছি না।

কিন্তু চলে যাব বললেই কি চলে যাওয়া যায় ?

শান্তিভূষণ তো আর পাগল হয়ে যায়নি, যে বিনা নোটিশে হঠাৎ মাকে নিয়ে গিয়ে
বউয়ের ঘাড়ে চাপাবে ?

কই নিয়ে গেলো না ছেলে ?

শক্তিভূষণ মুহূমন্দ হেসে বলেন, আমি তো পাগল ছাগল, তোমার ছেলেরা তো

ভালো ভালো—

কিন্তু এখন তো বাড়ি সব সময় নির্জন ।

এতো বড় বাড়িতে শুধু তো শেফালী আর বছর আঠেকের খুক্টা । শক্তিভূষণের কথা বাদ দাও । তিনি তো বারবাড়ির মানুষ । খুকুর চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ ? দুপুরটায় সে তো একটা স্কুলেও যায় ।

তবে কেন শেফালী রান্নাঘরের ছাদের ওই লোহার আংটাগুলোর একটা কাজে লাগায় না ? এখনো কেন শেফালী সকালে উঠে ঠুকঠুক করে কয়লা ভাঙে, কাঠ কাটে, উত্থন ধরায় ? বাটি করে একটু চাল ধুয়ে ভাত চড়ায় কুটনো কোটে বাটনা বাটে চায়ের জল চাপিয়ে পরোটার জন্তে ময়দা মাখে ? শেফালীর নিয়মের ব্যতিক্রম নেই ।

অতএব শক্তিভূষণেরও ব্যতিক্রমের প্রশ্ন নেই ।

তিনি যথারীতি সকালে উঠে ‘বাগান’ দেখেন, মন্দির মার্জনা করেন, শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ান । তারপর ধীরেস্থস্থে এসে তার জ্যাঠামশায়ের জায়গায় বসে ফুল কাঁসার রেকাবে করে কাঁচাটে পাকা পেঁপে, দরকোচা কলা, জোলো জোলো পাকা পেয়ারার টুকরোর সঙ্গে গরম পরোটা আর আলুচচ্চড়ি খেতে খেতে পল্লবিত গাছপালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কোন বিন্দুত অতীতে চলে যান ।

সদর দরজাটা খোলাইপড়ে থাকে, দাওয়ায় চৌকিতে বসে বসেই রাস্তার চলমান জন-শ্রোতের দৃশ্য দেখা যায় । বাজারের পথ । ও প্রান্ত থেকে লোক আসছে । একটুক্কণ দেখা যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে । আবার এ প্রান্ত থেকে লোক যাচ্ছে, একটুক্কণ দেখা যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে । কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই, হয়তো নিত্য মুখোমুখি হওয়া বাবদ একটু পরিচয় ঘটে, তুটো কথা হয় । হয়তো তারও সময় নেই ।

শুধু যতক্ষণ এরা একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওদের বলা হচ্ছে ‘সহযাত্রী’ ।

হঠাৎ যেন ভারী অবাক লাগে শক্তিভূষণের । এভাবে তো কোনোদিন ভেবে দেখিনি । সত্যি এরা কি সকলে একসঙ্গে পরামর্শ করে রাস্তায় বেরিয়েছিল ? অবশ্যই নয় । এরা কেউ কারো মতো নয় । পথ ওদের একটুক্কণের জন্তু কাছাকাছি আনছে আবার কে কোথায় চলে যাচ্ছে ।

তবে কেন আশা করবো, যারা কাছাকাছি হাঁটছে তারা আমার মতো হবে ?

এই দাওয়ার চৌকিটায় একদা আমার জ্যাঠামশাই বসতেন, আর বসলেন না : আমি এখন বসে আছি, হঠাৎ কোনোদিন আর বসব না ।...এই জমির টুকরোটা নিয়ে সারাজীবন কত আশ্বালন করলাম, ‘আমার জিনিস’ আমি যা খুশী করবো ।... হয়তো কালই এটা আর ‘আমার জিনিস’ থাকবে না । আর কেউ এটা নিয়ে যা

খুশী করবে। পাবার অধিকার পাবে।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশই অবাক হতে থাকেন শক্তিভূষণ।...অবাক হতে হতে বকের মতো কেমন একটা চাপ ধরতে থাকে!...অনেকগুলো সহযাত্রীর মুখ চোখের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়। কী যেন নাম ওদের?

আন্তে চৌকিটার উপর শুয়ে পড়েন।

আধখাওয়া চায়ের গ্লাসটায় একটা মাছি পড়ে ভাসতে থাকে।...

খবরটা রটল অনেক পরে।

শেফালী যখন ভাত বেড়ে ডাকতে এলো তখন জানতে পারল।

বাজারের পথ, খোলা দয়াজা, ভিড় হলো বইকি। যথেষ্ট ভিড় হলো।...শক্তিভূষণের সেই সহযাত্রীরাও সকলেই কেমন করে যেন এসে পড়ল। যাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন তখন শক্তিভূষণ।...

কী যেন নাম ওদের?

শোভা? বিভা? শান্তিভূষণ? দীপু? তিপু। তিপু তো ভাগ্যান্বেষণে তার দাদার বাড়ি গিয়ে উঠেছিল, একসঙ্গেই এসে গেল।

কিন্তু শেফালীতো ওদের জন্তে হাহাকার করে মরছিল। তবে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে না কেন? অনেকদিন না দেখে কি চিনতে পারছে না? চিনতে পারার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না শেফালীর চোখে!

ওরাও অবশ্য সে দৃষ্টির অভাবটা তেমন টের পাচ্ছে না। ওরা অনেক দিন পরে একত্র হয়েছে। ওরা হৈ চৈ করছে, কলকোলাহল করছে। খানিকটা কাঁদছে, অনেকটা হাসি গল্প করছে। আর প্ল্যান করছে সবটা বেচে দিয়ে যে যার ভাগ নিয়ে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী জায়গায় সেটল করাই সুবিধে, না এইখানের কোনো একটু অংশে দু'একটা ঘর তুলে মাঝে মাঝে পারিবারিক সম্মেলনের একটা জায়গা রাখা!...মেয়েরা বলছে, আহা যতই হোক, চিরকালের পাড়া, মায়া মায়া লাগছে একটু, ওটা হলে মন্দ হয় না। ছেলেরা বলছে, ওর কোনো মানে হয় না।... দু'কাঠা রাখা মানেই লাখখানেক হারানো।

এরই ফাঁকে ফাঁকে শ্রাব্দের আয়োজনও চলছে বইকি।...চিরদিন ভাড়া তক্তপোষে শুয়ে গেছেন বাবা, ষোড়শে একটা ভালো খাট দেওয়া হোক।...চিরদিন নিজেকে বঞ্চিত করে গেছেন, ব্রাহ্মণভোজনে ভালো করে খাওয়ানো হোক।

শক্তিভূষণের ছেলেমেয়েরা যে বাবাকে ভালবাসতো না, এটা ভুল।

কিন্তু শেফালীর কেন এতে কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ? থাকা তো উচিত ছিল ? বাবা তো ওদের কিছুই করেনি । অথচ ওরা বাবার জন্তে এতোটা করছে ! বাবার অংশীদার হিসেবে শেফালীর কৃতজ্ঞ হওয়া খুব উচিত ছিল ।

অথচ জাখো—

অংশীদার যে, সে হ'ল যে টনটনে রয়েছে । সেটি তো দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে ? আচমকা ধাক্কা মা একটু আপসেট হয়ে পড়েছে ভেবে, মাসিকে এনে কাজের চুকে যেতেও বলে কয়ে রেখেছিল ক'দিন । মাসি আর থাকতে পারছেন না । বললেন, আমায় তো এবার ছাড়তে হয় বাবা শাস্তি ।

শাস্তির হয়ে বউ বলে উঠল, আর দুটো দিন থাকুন মাসিমা, মার ওই ইয়ের থাওয়া-দাওয়া, আমরা তো এখন, ঠিক—মানে সোমবারেই তো আমরা মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছ ?

মাসি বললেন, তবে যে শিউলী বলছিল ও এখানেই থাকবে । যাবে না কোথাও । ও মা । এখানে থাকবেন কী ? কার কাছে থাকবেন ?—না না, ও ইয়ে করে বলেছেন ।

অর্থাৎ মনের আশ্বপে ।

কিন্তু মন নিয়ে তো আর বাস্তব জগৎ চলে না ।

শাস্তি মায়ের কথা নস্তাৎ করে দিয়ে থাকবে কী বল ! পাগল ? অসম্ভব কথা বলছ কেন ?

শেফালী বলল, অসম্ভব কিছুই নয় । চিরকালের জায়গা, চিরচেনা পড়শি তুম্বরা রয়েছে । শুধু ইভাকে তোর কাছে নিয়ে যা, ভালো ইঙ্কলে ভর্তি করে দিস ।

আর তুমি এখানে একা থাকবে ?

একা কেন শাস্তি ? তিনি তো এ মাটি ছেড়ে চলে যাননি ! এখানেই আছেন ।

এই সব সেটিমেন্টাল কথার তো কোনো মানে হয় না মা ।

শাস্তি বলে, এ সব তো বেচে দেওয়াই ঠিক করা হচ্ছে, এর মাঝখানে ক'দিন আর—

বেচে দেওয়াই ঠিক করা হচ্ছে !

হঠাৎ দপ্ করে জলে ওঠে শেফালী ।

এ সম্পত্তির অধিকার অংশীদার শেফালী দেবী, তা জানো বোধ হয় ? যখন তোমাদের অগ্র শরিকদের সঙ্গে সেটেল করা হয়, তখন আমার নামটা বসানো হয়েছিল । হয়েছিল । তা শাস্তি ভালই জানে ।

জানে, শোভা বিভা দীপু আর তিপু সুনল এখন ।

কেউ তাবেনি, তাদের বোকাসোকা হাউড়ে মা আবার হঠাৎ এমন শক্ত ভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়াবে ।

বলল, জানবো না কেন, জানি । এও জানি—তুমি চিরকালই এ সব বিক্রি করারই সপক্ষে ।...তুমি অবশ্যই সই দেবে ।

নাঃ । আমি সই দেব না ।

শেফালী বলে ওঠে, আমি যতদিন আছি যেমন আছে থাক ।

তুমি যতক্ষণ আছো !

দীপু মুহূ হেসে বলে, বয়েসটা নিশ্চয় আশির কাছে পৌঁছয়নি ?

তা সে যেখানেই পৌঁছক । ইতার তার নিতে তোমরা কেউ রাজি না থাক, থাকবে আমার কাছে । ওরও একটা পুরো ভাগ আছে তো ।

তুমি এভাবে কথা বলছ কেন মা ?...মনে হচ্ছে আমরা যেন তোমার প্রতিপক্ষ ।

বালাই ষাট । তা কেন হতে যাবি ?...আসল কথা কি জানিস বাবা, এতো দিনে বুঝতে পারছি, কেন তিনি সারাজীবন লড়ালড়ি করেছেন ।...আমিও কম করিনি ।

এখন বুঝতে পারছি কোথায় তাঁর বাধা ছিল ।...এখন ভাবতে পারছি না, এই জায়গা যেখানে তিনি ঘুরেছেন ফিরেছেন খেয়েছেন শুয়েছেন চায়ের গেলাস নামিয়ে রেখে চিরকালের মতো শুয়ে পড়েছেন । সেই সব জায়গা রোলার চালিয়ে গুঁড়ো করবে । শাবল ঠুকবে । গাঁইতি বসাবে । আমার শাশুড়ির ওই মন্দির উড়িয়ে দিয়ে এখানে ইমারত বসবে । আর আমার দিদি শাশুড়ির রান্নাঘরে—

শান্তিভূষণের বউ বরের হাল ধরে ।

বলে, ও সব ভালো ভালো কথা তো আগে কখনো শুনিনি মা আপনার মুখে !

শেফালী বলে, শান্তির কথাটা শান্তিকেই বলতে দাও বউমা ।

বেশ বলছি তাই—শান্তি বলে, তার মানে এটাই তো দাঁড়াচ্ছে, বাবা চিরকাল যা করে এসেছেন, তুমিও তাই করতে চাইছ ।

আমি যত দিন আছি, তাই চাইছি বাবা ।...

তার মানে সেই অভাব, সেই দারিদ্র্য, সেই দুর্দশা ?

আরে বাবা, জীবনটা তো কেটেই গেল । তার নতুন করে কোন্ দশা পাবো ?

দীপু ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তোমার জীবনটা না হয় গেল । কিন্তু আরও জীবন আছে । রাতদিন তো তাদের জন্তে কান্নাকাটি করেছ ।

শেফালী তাকিয়ে দেখে মুখগুলোর দিকে । সত্যিই বটে একদা এই মুখগুলোর মুখে হাসি ফোটাবার বাসনাতেই প্রাণ ফেটে গেছে তার ।

কিন্তু সে কি অনেক দিন আগে ?

তা নইলে সেই অহুভূতিটা কোথায় ?...ওদের সঙ্গে কবে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল শেফালী ? ওরা যেন অনেক দূরের মানুষ । মুখগুলো যেন অচেনা অচেনা ।

শুধু যে মুখটা এখানে অহুপস্থিত—

শেফালী হঠাৎ তাকে বুঝতে পারল ।

শেফালী শব্দ হয়ে তাকাল ।

বলল, কোনটা যে কখন বড় হয়ে ওঠে, আর কোনটা কখন ছোট হয়ে যায়, নিজেই কি জানে মানুষ ? এক সময় এই বাইশ নম্বর বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় লাঠালাঠি করেছে । এখন আর মরবার আগে এ দরজা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবতেই পারছি না । এখন এ বাড়ির বাইরে আমি কে ? আমার অস্তিত্ব কোথায় ?

শেফালীর ছেলেমেয়েদের ধারণা ছিল না তাদের মা ‘অস্তিত্ব’ শব্দটার মানে জানে, বানান জানে, উচ্চারণ জানে । আচমকা এই জানাটা দেখে ভারী রেগে গেল তারা ।...ওই জানাটার জন্তেই না তাদের সমবেত পরিকল্পনা অতএব ভেঙে গেল ।

খুব রেগে গিয়ে চলে গেল সবাই !

‘এ বাড়ির বাইরে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই ।’

কী নির্লজ্জ কথা ।

শান্তিভূষণবাবুর মা, এটা একটা পরিচয় নয় ? তবে থাকো একা এই প্রেতপুরীতে । অস্তিত্ব ধুরে ধুরে জল খাও ।...কারো এতো সময় নেই যে, তোমায় যখন তখন দেখতে আসবে ।...কারণ এতো টাকা নেই যে মনিঅর্ডার করে করে তোমার নিশ্চিন্ত সুরাহার ব্যবস্থা বজায় রাখবে ।

কাজেই ধরে নিতে হবে, এর পর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া একটি নামের অযোগ্য মহিলা এই বাইশ নম্বর টিয়াবাগানের অভিশপ্ত প্রেতপুরীর মধ্যে বসে বসে অস্তিত্ব বজায়ের লড়াই করে চলবে ।...হয়তো মাটি খুঁড়বে, শাক বুনবে, ঠুকঠুক করে কয়লা ভাঙবে, কাঠ কাটবে, গুল দেবে, ঘাস খেতে আসা গরুদের গোবরগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঘুঁটে দেবে, জ্বালানি কেনার মতো বিলামিতা করবে না কোনোদিন । গাছে ফস্টল ধরলে রান্নাটায় ছুটি নেবে, ঝি গোয়লা ধোবা এসব নাম ভুলে যাবে, আর পাড়ার কেউ বেড়াতে এসে যখন বলবে, শুধু শুধু এতো কষ্ট করছো কেন বাবা, খেটে সারা হচ্ছে, চলে যাও না ছেলের বাসায় । সেখানে কত সুখ, তখন গৌরব গৌরব মুখে বলবে সে তো একশবার ! ছেলেও তো নিয়ে যেতে ব্যস্ত, সাত পুরুষের ভিটে,

যে কটা দিন সাঁঝ সন্ধ্যা দিতে পারি। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা রয়েছেন তাঁর ফুলজল দেওয়া আছে, লক্ষ্মীর ঘটে অর্ঘ্য দেওয়া আছে।

আর যখন দরজার বাইরে থেকে পিয়ন কি ভোট চাইতে আসা লোক জিগ্যেস করে উঠবে শেফালী ভট্টাচার্য বলে কেউ থাকেন এখানে ?...

তখন মুখটা আরো গৌরব গৌরব করে বেরিয়ে এসে বলবে, হ্যাঁ আছেন। এই যে আমিই শেফালী ভট্টাচার্য ! কী দরকার বলুন ? নোটিশটা সই করে নিতে হবে ? দাঁড়ান কলমটা নিয়ে আসি—

ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ବ

তোমার এই ছেলেটিই ভোবাবে আমাদের, তা বলে রাখছি তোমায় ।

বাস স্ট্যাণ্ডে ছাউনি নেই, মুখের ওপর রোদ এসে লাগছে একটা তেয়ছা ছুরির মতো, মুখটা লালচে হয়ে উঠছে, সেই মুখটা আরো গনগনে হয়ে ওঠে এই চাপা আক্রোশের আক্ষেপে । যদিও বাস স্ট্যাণ্ডে শতলোকের ভীড়, তবু এখানেই নিশ্চিন্ততা । ভীড়ে কে কার কড়ি ধারে ? কে কার কথায় কান দেয় ? অথবা হঠাৎ ঠিকরে ওঠা কোনো কথার বিদ্যুৎ-ছটা, অথবা বাক্যাংশের একটা ছিটকে ওঠা ঢিল থেকে, কথার বিষয়বস্তুর সমগ্র ইতিহাসটা ধরে ফেলবে এমন ভয়ানক চতুর ব্যক্তিই বা পথে ঘাটে এত ঘুরছে কোথায় ? ‘প্রেমের’ ব্যাপার-ট্যাপারগুলো অবশ্য আলাদা । সে তো কথা না বলসালেও বোঝা যায় । শুধু পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া দেখলেও বোঝা যায় কে কার প্রেমিকা । কে কার প্রেমিক । অতএব তাদের টুকটাক কথায় কান দেয় । কিন্তু এই সব অপ্রেমের কথায় কেউ কান দেবে না । কাজেই যা কিছু তীব্র বক্তব্য অমিতার এই বাস স্ট্যাণ্ডে আসার সময়টুকুতে এবং বাসের জন্তে অপেক্ষা করার সময়টাতে ।

বাড়িতে অবাধ বাক স্বাধীনতার পরিস্থিতি কোথায় ? ওই প্রৌঢ় দম্পতি কি বাড়ি ছেড়ে নড়েন কোথাও দু’দণ্ডের জন্তে ? কর্তাটি অবশ্য ঠক ঠক করে বেরোন চৌদ্দবার শথে ইচ্ছেয়, গিন্নীর ফরমাস খাটতে, গিন্নীটি তো অনড় অচল । সংসারটাকে যেন শুধু দুহাতে আগলে রেখেও আশা মেটে না, দশটা হাত থাকলেই ভাল হতো এমন আগ্রাসী ভঙ্গী !

অমিতার কি কোনোদিন ইচ্ছে হতে পারে না ছেলেটা জ্বলে যাবার সময় ওর খাওয়াটা দেখি, কি টিফিনটা গুছিয়ে দিই । হবে কোথা থেকে ? ছেলের স্নেহময়ী ঠাকুমা ছুটে এসে সেখানে কাঁপিয়ে পড়বেন, থাক থাক বোমা, ও আমি দেখছি । তুমিও তো অফিস যাবে !

ই্যা, এই একটা অসুবিধে । অফিস যেতে হয় অমিতাকে সারাটা দিনের মতো । অতএব ওনার মূঠো থেকে সংসারটাকে নিজের মূঠোয় এনে ফেলবার ফাঁক নেই ।

অমিতার পিসতুতো দিদি লাভণ্য বলে, তুই বাবা খুব লাকী ! বরের সঙ্গে বরের অফিসেই চাকরী, বাড়ি ভাত খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে দু’জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়িস, ফিরে এসেই হাতে তৈরী চা, পছন্দসই টাটকা গরম জলখাবার ! সারাটা দিন সংসারের কামেলা পোহাতে হয় না, ছেলেটার জন্তে চিন্তাকরতে হয় না । তোর ওই শব্দের শাস্তড়ী দুটি তো ছেলে ছেলের বোয়ের সেবার জন্তে একপায়ে খাড়া । এ রকম বাবা দেখা যায় না । ছেলেকে আর বোকে সমান পর্যায়ে যত্ন-আত্তি । সাথে বলি লাক্ !

লাবুদ্রির কথা শুনে গা জ্বলে যায় অমিতার। আগে অমিতা লাবুকে কত ভালবাসতো, এখন ও এলেই অমিতার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এসেই খালি ‘মাসিমা মাসিমা মেসোমশাই মেসোমশাই! আপনারা কী ভালো!’ কী ভালো। এতো কী! বলতে তো পারে না অমিতা ওনাদের ওই যত্ন-আন্তি, সর্বদা একপায়ে খাড়ার মূলে কী আছে। লাবুদি একেবারে যে বিরোধী পক্ষ সমর্থক ওরা। বলতে গেলে অমিতাকেই ‘ছোট মন’ ভাববে। হঁঃ! নিজে শব্দ-শাওড়ীহীন ঘরে বোঁ হয়ে এসে কনে বেলা থেকেই সর্বেসর্বা, তুমি আর কী বুঝবে, অমিতার মধ্যে কী জালা। নিজের সংসারে, নিজে কুটুম। ‘আহা আহা, তুমি কেন? তুমি কেন? তুমি বোসো তুমি বোসো!’ ...মায়া! স্নেহ! হঁ। বুঝতে আর বাকি নেই অমিতার। গদিটি সামলাতেই এতো খাটা ওনাদের। অনেকদিন থেকেই অমিতা অন্ত্রধাবন করছে। এই পলিটিকসটি বুঝতে পারে অমিতার মা। বলতে গেলে মা-ই এতোটা চোখ খুলে দিয়েছে। মার সহানুভূতির দৃষ্টি থেকেই অমিতা টের পেয়েছে, সংসারে তার ভূমিকা একেবারে অনধিকারিণীর।

অথচ? অথচ সম্পূর্ণ অধিকারটি তো তারই হবার কথা। তার বরই বাড়ি ভাড়া জোগাচ্ছে, সংসার খরচ চালাচ্ছে, কাজের লোকের মাইনে গুণছে, কী নয়? লোক-লৌকিকতা ডাক্তার ওষুধ, খরচের শেষ আছে? সবই তো মনোজ্ঞের ঘাড়ে। বড়ো ভদ্রলোকটি কী করেন? তাঁর কী ছাই পেনশনের টাকা আছে, তাই দিয়ে দৈনিক বাজারটা আর হস্তার রেশনটা করে, মনে করেন অনেক করছি। তাও তো সবদিন মাছ-কাছ ছুঁবেলা জোটে না। মাঝে মাঝেই রাস্তার থাওয়ার পাতে ধোকার ভালনা ছানার ভালনার বাহার দেখিয়ে নিরিমিশ চালান। খেয়াল করেন না, অফিসে কাজ করা লোকেদের রাতের থাওয়াটাই আসল। কে জানে নিজেরা কর্তা গিন্নী বেলা ছুটোর সময় ধীরে স্নেহে বসে লাঞ্চটি সারেন কী দিয়ে। কেউ তো দেখতে যাচ্ছে না।

অমিতা বিদ্বা, অমিতা ভালো চাকুরীয়া মেয়ে, অমিতার জীবনের পরিধি চাকুরীতার থেকে অনেক বড়, তবু অমিতার সারাক্ষণের চিন্তাধারা আবর্তিত হতে থাকে, সেই ক্ষুদ্র পরিসরের গণ্ডিতুকুর মধ্যে, যেখানে চাকুরী নামের শীর্ণদেহী কর্মতৎপর প্রোটাটির জীবন আবর্তিত।

চাকুরীতা বিদ্বা নয়, চাকুরীতা ‘জীবন’ বলতে বোঝে আয়ুর খাতে পাওয়া তার এই দিন রাত্রির সমষ্টিটি মাত্র।

সকালটা গড়াতে গড়াতে রাতে পৌঁছয়, রাতটা ঘুমোতে ঘুমোতে, এবং পরবর্তী

দিনের বাজার কুটনো, রান্নাবান্নার ভাবনা ভাবতে, আবার সকালের মুখোমুখি হয়, এছাড়া আর কী? এরই মধ্যবর্তী অংশটিতে সুখ দুঃখ, সুবিধে অসুবিধে, আশা হতাশার লীলা চলতে থাকে। এই পর্যন্ত! চারুলতার ‘জীবন’ ভবানীপুরের এই ভাড়াটে দোতলা বাড়িটার রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খাবার ঘরের মালিকানার মধ্যেই চরিতার্থ।

কিন্তু অমিতা?

যার হাতের মুঠোয় এই বিশাল পৃথিবীখানা, যার জন্তে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি কর্মজীবন, সেও কেন ওই ছোট্ট ঘর তিনখানার মালিকানার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা দেখে? আর তার কর্মগত অসুবিধার জন্ত সেই ঘর তিনখানায় আধিপত্য বিস্তার করতে পায় না বলে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, ‘জীবন’ পেলাম না।

যেন ওই হাতে একগাদা লোহা শাখা পরা, কপালে এক গাদা সিঁদুর লেপা গাঁইয়া চেহারার মহিলাটি অমিতার জীবন পাওয়ার উপকরণগুলো কজা করে ফেলে ঠকিয়ে চলেছেন অমিতাকে।

অমিতা যখন দেখতে পায় ওই মহিলা পরম পরিতৃপ্তির ছাপ মুখে মেখে, আলু পটল বেগুন কুমড়া কপি কাঁচকলার সম্ভার ছড়িয়ে বঁটিটি নিয়ে বসে থরে থরে স্ট্রেট চলেছেন, তখন ঈর্ষায় বিরক্তিতে অমিতার মাথা জলে ওঠে। ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই পরিতৃপ্তির সাম্রাজ্য!

আশ্চর্য বৈ কি! তবে কি অমিতাও চারুলতার মতই ওই আলু পটল কুমড়া কাঁচকলাকেই জীবনের উপকরণ ভাবে? ভাবেই নিশ্চয়, না হলে অমন রোষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কেন একটা চামড়া কুঁচকে আসা রেখাঙ্কিত মুখের পরিতৃপ্তির রেখার দিকে?

অথচ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে কেড়ে নিয়ে, সাম্রাজ্যটাকে আয়ত্তে এনে ফেলবার উপায় নেই অমিতার। বড় বন্দিনী অমিতা।

অফিসের ছুটির দিনটিনগুলো আছে বটে, কিন্তু সেখানে আবার আর এক দিকের বন্দীত্ব। শহরের উচ্ছলিত প্রমোদ প্রবাহের উজ্জলিত আকর্ষণের হাতছানি অহরহই প্রলুব্ধ করে চলেছে। তাকিয়ে দেখার সময় নেই। সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন, সেটাকেও তো উপভোগ করতে ইচ্ছে করে।

বাচ্চাটাকে কিছু আমোদ-প্রমোদের স্বাদ দিতে হয়। অতএব বড় নিরুপায়তা।

কিন্তু এ তো গেল একটা দিক। আর এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের চিন্তা উদ্বেল করে তুলেছে অমিতাকে। ক্রমশঃই দেখতে পাচ্ছে অমিতার সংসারটির মতো অমিতার

ছেলেটাকেও যেন মুঠোয় ভরে ফেলছেন ওই কর্তা গিন্নী। মাকে খোড়াই কেয়ার করে ছেলে। ‘দাদু’ ‘দিদা’ই সব।

গতকালই কি একটা ছুটি ছিল, অমিতা তাতাইয়ের মাছের কাঁটা বেছে দিতে বসছিল, ছেলে একেবারে হাত পা ছুড়ে রশাতল। তুমি না। তুমি না। দিদা দেবে। তুমি একদিন কাঁটা বেছে আমার গলায় কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিলে। দিদা একবার বললেন বটে, ‘ও কি রে তাতাই। কবে আবার?’ কিন্তু সে তো ফর শো! ভেতরে ভেতরে তো মজা দেখছেন। অমিতার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অমিতার মধ্যে একটা হাহাকার। একটা জ্বলন্ত ক্রোধ!

সংসার পাবে না, ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর অমিতা বন্ধুর মতো তাকিয়ে দেখবে, আর নিঃশ্ব হয়ে যাবে?

স্বামী?

তাই কি পুরোপুরি পেয়েছে অমিতা?

সেখানেও তো ‘মাতৃপিতৃভক্ত’ সন্তানের ভূমিকায় বন্ধ একটা মানুষকে আংশিক পাওয়া মাত্র।

অমিতার এই ‘জীবনটা’ না পাওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে সে?

মোটেরই না। অমিতা বোঝে, অমিতা যখন আপসা আপসি করে, তখন মনোজ বোকা বোকা মুখে বিষন্নতার ভান করলেও আসলে ভাবে দুঃখটা অমিতার চিন্তার বিলাস!

এক একদিনের কথায় বেরিয়ে পড়ে বৈ কি। পড়বে না? ভিতরে তো সেই ধারণাটা বন্ধমূল। তাই অমিতার কথায় বলে ওঠে, রাখো না ওসব হলুদ পাঁচফোড়নের চিন্তা, কেমন মজাটিতে আছি বল তো? প্রত্যেকে আমার লাক দেখে হিংস করে। তোমাতে আমাতে দু’জনে রোজ একসঙ্গে ভাত খেয়ে দু’জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, এক আপিসে কাটাই, আবার একসঙ্গে ফিরি, এবং বাড়ি দেখতে, বাচ্চাটাকে দেখতে কর্মঠ মা বাবা মজুত, এ একেবারে হিংসের জ্বালা ধরিয়ে দেয় ওদের।

মাঝে মাঝে যেন এমনি কথা, গল্পের ছলে ওর কোনো চেনা পরিচিত বন্ধুজনরা একা একা ক্যাটবাড়ির সংসারের ম্যাও সামলাতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা বিবরণ দিতে বসে। অমিতা যেন এই গল্প করার মানে বুঝতে পারে না। শ্রেফ অবোধের ভান করে অমিতাকে বোঝানো—‘জ্বাখো বোঝো একা থাকার কত সুখ। আর বোঝো তুমি কত আরামে আছো।’

আরাম আর সুবিধেটাই সব।

‘স্বাধীনতা’ বলে একটা শব্দ নেই?

এ যুগে একা সংসার আবার কে না করছে ? আবার উপার্জনের চেষ্টায় কোন মেয়েটাকে না বাইরে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে ? তাদের বাচ্চারা মানুষ হচ্ছে না ? না, তারা খাওয়া দাওয়া করছে না ?

তর্কে নামলে—অমিতা বলবে, অনেক ভালভাবেই করছে, অনেক পরিচ্ছন্নভাবেই হচ্ছে ।

আধুনিক জীবনের স্বাদ তো কখনো পেলে না বুদ্ধু, তার স্বপ্নও দেখলে না ।

অমিতাই এতোখানি বয়েস পর্যন্ত তার বার্থ স্বপ্ন বহন করে চলেছে ।

অমিতার বান্ধবীদের বাড়িতে কিচেন কি ছিমছাম । কী নিপুণভাবে সুন্দর খাবার বানিয়ে ভালো টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলে । ঠিক টি ভি-র পর্দায় দেখা বিজ্ঞাপনের ছবির মতো । ইংরিজি বাংলা পত্র পত্রিকায়, কত দুর্দান্ত রান্নার ‘রেসিপি’ শিখিয়ে চলেছে । কত শোখিন সুন্দর সরঞ্জাম ঘর আলো করে বসে আছে, অমিতাই শুধু সেদিকে ভিথিরির মতো তাকিয়ে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে ।

আর খেয়ে মরে দু’বেলাই সেই ডাল চচ্চড়ি স্ক্রু, ডালনা চাটনি । মাছ মানেই ঝোল ঝাল কি ভাজা ! ইলিশের সদগতি একমাত্র সর্ষে ঝালে । অথচ অমিতার বান্ধবী রেখা সেদিন ওকে ভিনিগার দিয়ে রান্না ইলিশের একটা প্রিপারেশান খাওয়ালো, কি দারুণ ! সবাইকে আমার বাড়ির ব্যাপার ওদের কাছে বলতে লজ্জা করে । ‘মাংস’ মানেই মাংসর ঝোল । ওছাড়া যে আর কিছু হতে পারে মাথাতেই আসে না আমার শাশুভী ঠাকুরানীর । তাও আর নিজে খান না । অতএব রান্নাঘরে তার প্রবেশ নিষেধ । বাইরের বারান্দায় আলাদা করে । আর মূর্গীর প্রশ্ন তো ওঠেই না । শুনে রেখা গালে হাত দিয়ে বলেছিল, ইঁয়ারে এখনো এরকম বাড়ি আছে ? আর তুই, তার সঙ্গে তাল দিয়ে চলিস ? মূর্গী ঢোকে না ! এখন তো সঙ্কলের কিচেনেই হাম । দে বাবা, তোর একটু পায়ের ধুলো দে, মাথায় ঠেকাই !...তবেই বোঝ, অমিতা বেচারী কোথায় পড়ে আছে ।

অথচ মনোজ এগুলো ধর্তব্যই করে না । বলে, ইঁা সব বাড়ি দেখে বেড়াচ্ছে তোমার বন্ধু ।

একবার অমিতা জোর করে কিছু আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল । প্রেসার কুকার, (এবাড়িতে এখনো প্রেসার কুকারও ‘আধুনিক’ ।) রাইস কুকার, ওভেন আর একবার একটা গ্রাইজ কুপনে পেয়েছিল একটা সুন্দর ‘মিক্সচার’ । কিন্তু অতঃপর ? অতঃপর তারা বাড়ির ভার বাড়িয়ে তাকের ওপর তোলা আছে । সেই মাঙ্কাতার আমলের হাঁড়ি সরা কড়া চাটু শিলনোড়া নিয়েই কাজ চলছে ।

মহিলা বিনা লজ্জায় বললেন, রন্ধে করো বোমা । আমার দ্বারা ওসব কল-কাঠি

নেড়ে রান্না হবে না বাছা, ও রেখে দাও উঁচু তাকে। গনগনে আগুনে হাঁড়ি কড়া চাপাবো, রান্না হয়ে যাবে। শিলনোড়ায় মশলা ফেলবো, মিটে যাবে। তোমার ওই যন্ত্রপাতির তরিবৎ করায় সময় বেশী লাগে বাবা। পরে তুমি রোঁধো।
পরে! কোন্ পরে? তোমার পরলোক গমনের পরে? তখনো এনার্জি থাকবে অমিতার? অসহ।

হ্যাঁ, কয়লার ধোঁয়া করে গনগনে উত্তুন একটা চাই ওনার। গ্যাসের সিলিণ্ডার আছে বটে, তাতে হয় শুধু চা জলখাবার। সেটা ভাতের সঁকড়ি হবে না। তাহলে নাকি বিস্কুততা বজায় থাকবে না!

শুনে রেখা ছন্দা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। যদি বা মনোজ জোর করে বলেছিল, বিকেলে অন্ততঃ কয়লার ধোঁয়া না করে ওতেই রোঁধো। রাস্তিরে তো কেউ ভাত খাচ্ছে না।

তা আমার পূজনীয় শ্বশুরঠাকুর একদিন খেয়েই বললেন, “রাম বলো! ও রুটি আবার মালুবে খায়?” যেন শহরসুন্দু মালুঘ সবাই ‘অমালুঘ’!

যাকগে, এসব কথা ফুরোবার নয়। অমিতার একটি আধুনিক জীবনের স্বপ্ন স্বপ্নেই থেকে যাবে। কিন্তু—

হ্যাঁ, ওই একটা কিন্তু অমিতাকে উদ্ভাস্ত করে তুলছে। ছেলেটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। আর তাই বসে বসে দেখতে হচ্ছে অমিতাকে। ছেলে তার দাহুর নকল করে শব্দ করে থাকে, থ্যাক থ্যাক করে কাসবে, ‘টেবিলে থাকো না, দাহুর মতন মাটিতে বসে থাকো’ বলে বায়না করবে। আর—

দিদার কাছে রান্নাঘরে বসে কুলের আচার খাবে টকাস টকাস করে, এবং যত রাজ্যের সেকলে সেকলে পচা পচা গল্প শুনবে। শুধু এই নয়, আবার না কি ‘কেষ্টঠাকুরের শতনাম’ মুখস্থ করা হয়েছে। দাহু দিদা শুনে মুগ্ধ। হুঁতগ্যা, ছেলেটার ‘বারোটা বেজে’ যেতে আর বাকি কি রইল?

পাজীটা আবার এত শয়তান হয়েছে, জানে মা এসব হুঁচক্ষে দেখতে পারে না, তাই মাকে রাগাতে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে ‘আজ হুপুর্ কোন্ গল্পটা দিদা? ঢেঁকি চিংড়ির?’ আর ‘বান্দর রাজাটারও’ বলতে হবে কিন্তু। আর হি হি, গোপাল ভাঁড়ের।

ঢেঁকি চিংড়ি! বান্দর রাজা! গোপাল ভাঁড়! অসহ।

একদিন আর না বলে পারে নি অমিতা, বলে ফেলেছিল, ‘এসব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গল্প বলার কোনো মানে হয়? তো শুনে ছেলের দিদা যদি বা একটু থমকালেন, দাহু একেবারে হেসে ছাত ফাটালেন। কথার কী বৃত্তি, এইসব ‘বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি

গল্প' শুনে ওর বাপও মাহুষ হয়েছে বোমা। শুধু বাপ কেন, ঠাকুর্দাঁও। তাতে কিছু কৃতি হয়েছে? তোমার সবচেয়ে আতঙ্ক! চিরজন্ম ছেলেপুলেকে ভূত, ভগবান, জন্তু জানোয়ার পাখিপক্ষীর সঙ্গে পরিচয় করানো হয় এই সব গল্পে দিয়ে দিয়েই তো? তো তার সঙ্গে একটু মজাটজা না মিশোলে ওরা আকৃষ্ট হবে কেন? আজীবনই দেখেছি ছেলেদেরকে 'একানড়ে' বেঙ্গদতি, শাঁকচুম্বি, মামদো ভূতের ভয় দেখিয়ে বাগে আনার রেওয়াজ! তাতে হতোটা কী? তুমি একেবারে ভয়ে কাঁটা, ওতে ছেলে ভীতু হয়ে যাবে। আর এই যে আজকাল দোকানে দোকানে বাচ্চাদের জন্তো দোহান্তা এতো ভূতের গল্পের বই দেখি? এতে তো তাহলে দেশহুঙ্কু ছেলেপুলে ভীতু হয়ে যাবে গো মা!

শুনে মাথা থেকে পা অবশি জলে যায় না? নেহাৎ তখন সিনেমার টিকিট কাটা রয়েছে, টাইমওটার হয়ে যাচ্ছে, তাই জ্বলতে জ্বলতে চলে যেতে হলো। নইলে হয়ে যেতো একটা ফাটাফাটি।

আর এ সবই তাতাইয়ের নামনে। কী চমৎকার শিক্ষা হলো তার? অমিতা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন শয়তানটা কিনা রেলিঙে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, দাদুর কাছে হেরে গেলে! কলা কলা! মনোজকে তো শুনতে হয় না এতো। তখন তো ও সিনেমা 'হল্'-এর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টিকিট হাতে নিয়ে।

মনোজকে এই পরিস্থিতির পরিণাম বোঝাবে, এমন সময় কোথা? রাত্রে? শয়তান ছেলে কখন ঘুমোয়, কখন জেগে থাকে বোঝা শক্ত। এই তো হঠাৎ সেদিন। ঘুমে 'অচেতন' ছেলেটি কিনা হঠাৎ হি হি করে বলে উঠল, 'দিদার নিন্দে করা হচ্ছে? দিদাকে বলে দেব।' ওঃ। এতেও যদি ডাক ছেড়ে চোঁচাতে হচ্ছে না করে কিসে করবে? কী ভাগ্যি 'মনোজবাবু' সেদিন ছেলেকে শাসন করতে বলে উঠেছিলেন, 'কাল থেকে তোমায় নীচের তলায় সিঁড়ির ঘরে শোওয়ানো হবে, অসভ্য বাদর' ছেলে। 'নিন্দে' আবার কী! কেউ কারুর কথা গল্প করে না? এই যে আমি ঘর অগোছালো করি, দাড়ি কামিয়ে জিনিস ফেলে রাখি, এসব কথা বলে না তোমার মা? সেটা নিন্দে হয়ে গেল? ঠিক আছে। ওই সিঁড়ির ঘরে আরশোলাদের সঙ্গে শুয়ো।

বাপের ওই শাসনে ছেলের একটু কাজ হয়েছিল। বলে ওঠা হয়েছিল, ঠিক আছে। কাল থেকে আমি কানে আঙুল দিয়ে ঘুমোবো।

কিন্তু বিষবৃক্ষের কী একটাই ডাল? না সব ডালগুলোই একরঙা? আজ অমিতা একটা কিছু করেই ছাড়বে।

প্রার্থিত বাসটি আসতে দেবী করছে ।

মনোজ অমিতার লাল লাল মুখের দিকে তাকাল । ‘ছেলেটাই যে তাদের ভোবাবে’ এ অভিযোগ অমিতার মুখে নতুন শুনল না, তবে মুখটা অমিতার যেন আজ বড় বেশী লাল । আস্তে বলল, আবার কী হলো ?

হচ্ছে প্রতিনিয়তই, তুমি তার কতটুকুর খবর রাখো ? আজ আমায় কী বলেছে জানো ? ‘টিফিনে দিদার তেঁতুল আচার একটু নিয়ে গেলেই যতো দোষ ? আর নিজেরা যখন রাস্তায় বেরোলেই ময়লা ভাঁড়ের তেঁতুলজল দেওয়া ফুচ্কা খাওয়াও ! তখন দোষ হয় না ? দিদারা যেন তোমার শত্রুর । না ?’

চোখে সর্ধফুল দেখাটা এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তবু মনোজ সেটা দেখল এখন থতমত খেয়ে বলল, এই কথা বলেছে ?

তো কি আমি বানিয়ে বলছি ?

না, মানে ব্যাপারটা তো দেখছি ক্রমশ ডেঞ্জারাস হয়ে উঠছে ।

যাক্ তবু একটু বুঝলে । কানও দাও না, চোখও দাও না, তলে তলে আমাদের ভবিষ্যতের কী সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ভেবে দেখো ।...আবার জাখো না তুমি ছেলে-বেলায় কত দুষ্ট ছিলে কত অবাধ্য ছিলে কীরকম লুঠপাট করে তোমার ঠাকুমার ভাঁড়ার থেকে আমসত্ত্ব কুল তেঁতুলের আচার খেয়ে নিতে গাদা গাদা, দুধ খাওয়ানোর জন্তে ঢোকে ঢোকে গল্প বলতে হতো তোমায়, এইসব যত গল্প ইতিহাস নাতির কাছে বলা চাই । এগুলো বলার কোনো দরকার আছে ? ছেলের দুঃসাহস বাড়ানো ছাড়া ? এতে তোমার ওপর ভয় সমীহ থাকবে তাতাইয়ের ?

উত্তেজিত এই প্রশ্নের মধ্যেই বাসটা এসে গেল । সেখানে আর ওই উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন নেই । দুজনেরই হ্যাগোল ধরে ঝুলন্ত অবস্থা । তবে ঝুলন্ত দুজনে যে কোনো অবস্থাতেও মন তার নিজের কাজ করে চলতে পারে । কাজেই উত্তরটা মনোজ মনে মনেই দিতে থাকে, দিয়ে চলে ।

এতো বেশী উত্তেজিত হবার মত কী এমন ঘটনা ঘটেছে হে মহিলা ? তুমি তো দেখছি সর্বদাই দড়িকে ‘সাপ’ ভেবে আঁৎকাচ্ছে । বলি আমার ছেলেবেলায়, আমার ঠাকুমা আমার বাবার শৈশবকালকে আমার কাছে বিবৃত করতেন না রসিয়ে রসিয়ে ? আমার যত দুষ্টমীর আর বেয়াড়াপনার গল্প বলতেন না ? তাতে আমার ইহকাল পরকাল সব ধ্বংস হয়ে গেছে ? বাবার ওপর আমার ভয় সমীহ ভক্তি ভালবাসা জন্মায় নি ? মা বাপের ওপর আমার ভক্তি ভালবাসা নিয়ে টিপ্পুনি করতে ছাড়া ?

মনের মতো স্বাধীন আর কে আছে ? কে আছে চিন্তার মত ‘অবাধ গতি’ ?

ভাগ্যিস আধুনিক ‘বিজ্ঞান শক্তি’ এমন একথানা ‘এক্স-রে আই’ বানিয়ে বসে নি এখনো, যেটা চশমার সঙ্গে স্টেটে নিয়ে পরে বসে থাকলেই অপর জনের এই চিন্তা-ধারার ধরন, ধরে ফেলতে পারবে ? বিজ্ঞান যদি পৃথিবীর ভেতন ছুরবস্থা এনে দেয় কোনোদিন, সেটাই হয়তো পৃথিবীর শেষ দিন হবে ।

যাক, এখনো আসেনি তেমন ছুরবস্থা । তাই মনোজ ভেবে চলতে পারে, ছেলের দোষ দেওয়া হচ্ছে । আর দোষ দেওয়া হচ্ছে গুরুজন দুজনকে । হে আধুনিকা, উঠতে বসতে খেতে শুতে তুমি সারাক্ষণ করো না ওনারের দুজনের সমালোচনা ? তীব্র কটু কষায় বাঁজালো ঝাল । সেই সব সমালোচনার ভার ওই অবোধ শিশুটার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে, ভেবেছ কোনোদিন সে সব ?

ছেলের কুশিক্ষা হবে, ‘রাজা বাদরের’ না কি আর ‘গোপাল ভাঁড়ের’ গল্প শুনেই ? গোপাল ভাঁড়ের গল্প না শুনে আবার কোন্ বাঙালীর ছেলেটাই বা মানুষ হয়েছে ? আমি শুনি নি ? অসভ্য গাঁইয়া হয়ে গেছি ? আমার ঠাকুমাও তো আমায় ‘জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর’ শিখিয়েছিলেন, তাতে বারোটা বেজে গেছল আমার ? খোল কর্তাল নিয়ে হরিনাম করে নেচে বেড়াচ্ছি ? কুশিক্ষা ! ছেলের কানের কাছে গুরুজনদের সম্পর্কে সর্বদা সমালোচনা কুশিক্ষা নয় ? বাপের ওপর ছেলের ‘সমীহ’ আসবে না ! হায় অদৃষ্ট ! তুমি তো ছেলের সামনে আমাকে রাতদিন কচুকাটা করছ, তাতে কোনো রি-অ্যাকশান হচ্ছে না ?...আমি আমার জীবনের একটি পরিচিত ছাঁচের মধ্যে বর্ধিত হয়েছি, সেই ছাঁচের মধ্যে স্রবিশে অস্রবিশে দু রকমই আছে তবু তার সম্পর্কে আমার গভীর একটা মূল্যবোধও তো আছে । আমার মা বাপ পরিচিত পরিজন সকলের মধ্যে থেকেছি, সব কিছু মানিয়ে নেওয়া জানি । সেখানেই এই মনোজ রায়ের সত্তার অস্তিত্ব । সেখানেই মনোজ রায়ের জীবনের শিকড় । সেই জীবনের মধ্যে তুমি এসে দাঁড়ালে । এসেই তুমি আমার সেই সত্তার অস্তিত্বকে ঘৃণা আর ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখলে, আর তৎক্ষণাৎ থেকেপ্ত করলে আমাকে শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বাসনার মাটিতে পুঁততে । কিন্তু—সেই মাটিটি আমাকেই সংগ্রহ করে দিতে হবে । আশ্চর্য এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা । তুমি একখানি অনাস্বাদিত আধুনিক জীবনের স্বপ্ন দেখছ, সেই স্বপ্ন সফল হওয়ার জগ্গে তুমি উত্তাল হচ্ছেো, অস্থির হচ্ছেো, দাম্পত্যজীবনের সমস্ত মনোরম মুহূর্তগুলিকে ক্রোদ্ধ করে তুলছ । তোমার এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমার আর গতি নেই । কারণ আমি একটু শান্তির কাঙাল । আমি সেই শান্তিটুকু কিনতে

যুধিষ্ঠিরের পাশার পণের মতো ‘সর্বস্ব’ পণ ধরে বসেছি।

আমার হ্যায় নীতি, বিচার বিবেচনা বোধ, সভ্যতা ভব্যতা, চক্ষুজ্ঞা সব কিছুই তো ওই সর্বস্বের ঘরে জমা আছে? কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি, তোমার তীব্র বাসনার ক্ষুধার আকর্ষণে সে সমস্তই খোয়াতে হবে। হবেই। চোখের সামনে আকাশের গায়ে সেই লেখা ফুটে উঠতে দেখছি। ‘ওরে মূঢ় শান্তিপ্ৰিয়, তোর নিস্তার নেই! তোর বধকার্য আসন্ন। হাড়িকাঠ তৈরী হচ্ছে।’

আশ্চর্য! কেন আমি ওই অধৈর্য্য অসহিষ্ণু জেদি আত্মকেন্দ্রিক হৃদয়হীন রমণীটিকে এত ভয় করি? কেন কিছুতেই তার অন্তায় কথাগুলোর প্রতিবাদ করে উঠতে পারি না? ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আত্মার বিরুদ্ধে নিরুপায় সমর্থন করে চলি? নিশ্চিতই তো জানছি ও আমার একান্ত নিজস্ব স্বর্কের আর নিশ্চিত্ততার জীবনটি থেকে উৎপাটিত করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে আছড়ে ফেলতে চায়। তবু আমি সেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস সক্ষম করতে পারি না।

আমার যেখানে যত আত্মীয় আছে, তাদের সবাইকে তুমি তাহিল্যোর দৃষ্টিতে দেখবে, তারা বেড়াতে এলে বেজার মুখে ঘুরে বেড়াবে, আর তারা কথা কইতে এলে এমন ‘শীতল’ উত্তর দেবে যে, আর দ্বিতীয়বার তারা তোমার দিক ঘেঁষতে আসবে না। কারণ তারা তোমার ওই অতি আধুনিক বান্ধবীদের মতো কৃত্রিম নয়। তারা মেকি পালিশের জোরে তোমার কাছ থেকে মুক্ত পূজা পাচ্ছে। আশ্চর্য!

আমার তো ওদের দেখলেই হাড় জলে যায়। ওই যে ভঙ্গী, যা কিছু বাঙালীয়ানা, তাই দেখেই অবাক হওয়া, আকাশ থেকে পড়া, যেন জীবনে এসব দেখে নি শোনে নি। উঃ। তোমার এক বান্ধবী যেদিন চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে বলেছিল, ‘কচু’ জিনিসটা সত্যিই খাওয়া যায়? খায় কেউ? য্যাঃ! কচু ঘেঁচু তো একটা ঠাট্টার কথা!

তিনি নাকি জন্মে কখনো জানেন না—কচু জিনিসটা কেমন দেখতে!

এই অসার ভেজাল মালগুলিই তোমার আদর্শ। তোমার উপাস্ত দেবী।

অথচ নিজেকে তুমি খুব বুদ্ধিগলা ভাবো।

চিন্তা অবশ্যই বাতাসের থেকেও অগ্রগামী তাই ভবানীপুর থেকে ড্যালহাউসি আসার পথটুকুতে মনোজ রায় নামের লোকটা এতো অজস্র কথা ভেবে চলেছে। না কি বলে চলেছে?

তা বলেই চলেছে নিঃশব্দ উচ্চারণে—আমার শৈশবে কী দেখেছি আমি, ঠাকুমা সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ঠাকুমার তয়ে আমার মা কাঁটা। আর এখন কী দেখছি?

এ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা 'তুমিই। মা তোমার ভয়ে কাঁটা। মার সাহস নেই তোমার ওপর একটা কথা বলবার। মার পোষ্ট মাত্র সংসারে সেবিকার! আমার বাবা! হয়তো বাবা মার মত অতটা বুদ্ধি ধরেন না বলেই, মাঝে মাঝে কিছু বলে ফেলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখ্যমির শাস্তিও পান। আমি সে শাস্তির নীরব দর্শক। সরব হবার উপায় বা কী? তাতে ওনার লাঞ্ছনা বাড়বে বৈ কমবে কী? নিরুপায়তাটা তো এইখানেই। তোমরা 'আধুনিক'। অতএব নির্লজ্জ হতে বাধে না তোমাদের।

কী তুচ্ছতার মধ্যেই তোমার মন আবর্তিত অমিতা। ভাবলে মাথা কাটা যায় আমার। ভেবে দেখো সেদিনের কথা? ধোবার হিসেবটা তুমি লেখো। সেই জন্তে তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে রবিবারে আসার জন্তে এবং ধোবাটাকে তুমি 'বাড়ির ধোবা' মাত্র না ভেবে, নিজের বলে মনে করো।...তা করো বেশ করো, কিন্তু লোকটা সেদিন বাবার একটা ধুতি হারিয়ে দিয়েছিল, এই কথাটি বলা মাত্র তুমি সাপিনীর মতো ফৌস করে উঠলে? তুমি জোর দিয়ে বললে, না আপনার ধুতি যায় নি।

আর তা হলে লেখা বোধহয় লেখা হয় নি এই সন্দেহ প্রকাশ করায়। তোমার অহমিকায় এমন আঘাত লাগল যে, তুমি তার পরের সপ্তাহে আমার মা বাবার ময়লা জামা কাপড় আলাদা করে সরিয়ে রাখলে! তুমি অনায়াসে বাবাকে বলে গেলে, 'ওগুলো আপনিই লিখবেন।'

কত অবলীলায় মানুষকে অপমান করতে পারো তুমি অমিতা, সেদিন আর একবার নতুন করে দেখলাম। মুক বধির অন্ধের ভূমিকায় সে দৃষ্টি দেখে যাই আমি।...

অথচ অমিতা তোমার নিজের বেলায় মনের কানা কী টনটনে। বাতাসের ভর সন্মন। এ বাড়িতে কেউ ভাবতে পারে না, তোমার কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে, কিংবা তোমার কোনো কাজের ভুল ধরবে। অথচ তুমি? অমিতা, তুমি প্রতিটা মানুষের প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে, তীব্র মন্তব্য করবে, আর প্রতিটি কাজের ভুল ধরবে। তোমাকে যে কোনো পরামর্শ দেওয়া যায়, এ প্রশ্ন নেই অমিতা! তুমি জানো তোমার কথাই শেষ কথা। আমি তোমার সেই তালে তাল দিয়ে চলেছি। আধুনিকতার এই অভিশাপ অমিতা, এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টের কোন প্রশ্ন নেই। হয় এম্পার নয় ওম্পার। কিন্তু অমিতা, তুমি যদি আমার চিরকালের অভ্যস্ত জীবনের হাঁচটার সঙ্গে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের চেষ্টা করতে! না, সে চেষ্টার ইচ্ছেই হয় নি তোমার কোনোদিন। তুমি অবিরত মনে মনে হাতুড়ি কুড়ুল শাবল গাঁইতি দিয়ে সেই হাঁচটাকে ভেঙ্গে চলেছ। এখন মনে মনে ক্রমশঃ হাতেই চলে আসবে ওই হাতুড়ি শাবল গাঁইতি। আর তারপর আমার সারা জীবনের অভ্যাস বিশ্বাস ধারণা

মূল্যবোধ, আমার সেন্টিমেন্ট, আমার চিরদিনের আত্মীয় সমাজ সব কিছুকে নষ্টাং করে তুমি আমাকে দিয়েই তোমার বাসনা বিস্কুর হৃদয়ের কল্পনা আশ্রিত হাঁচটি বানিয়ে নিয়ে আমায় তার মধ্যে ভরে ফেলবে। যেমন চিড়িয়াখানার মালিক তাদের মজবুত খাঁচার মধ্যে তার ধরে আনা জন্তু জানোয়ারদের পুরে ফেলে।

তা এই ‘আধুনিকতা’ নামের বিকৃতির হাঁচের চিড়িয়াখানায় এমন অনেক শিকারই পোষ মেনে বসে আছে। অতএব আমার কেস্টা নতুন কিছু ব্যতিক্রম হবে না। ক্রমশঃ আমরা এই ‘আধুনিক’ নামধারী পুরুষরা তোমাদের আর মনে করিয়ে দেবার সাহস অর্জন করতে পারছি না, ‘মামুষ ইঁট কাঠ নয়’। প্রতিবাদ করে উঠে বলতে পারছি না। ‘কেন আমরা আমাদের অতীতকে মুছে ফেলে, তোমাদের হাঁচের মধ্যে ঢুকে পড়ব?’

কিন্তু কেন পারছি না?

সেইটাই তো রহস্য। অথচ তিলে তিলে অহুভব করছি, ক্রমশঃই আমি আমার সন্তা হারিয়ে ফেলতে ফেলতে তোমার সেই ভবিষ্যৎ হাঁচের অন্তকূল মূর্তিতে গড়ে উঠছি।

আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এই দ্রুত পরিবর্তিত রূপের দিকে বড় বেদনা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমার মা, আমার বাবা।

তঁারা তো এমন অসম সাহসিক ভাবনা ভাবতে পারবেন না। তোমার ওই সরল প্রবল অধিকারের মুষ্টি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের ছেলেটাকে, তাদের একমাত্র সন্তানটিকে আবার তার নিজস্ব চেহারায় কিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তঁারা মেনে নিয়েছেন। তঁারা বুঝে নিয়েছেন যে জমিটা তঁারা বিকিয়ে দিয়েছেন, সে জমিতে তার নতুন মালিক ধানই বৃহৎ আর পাটই বৃহৎ বলার কিছু থাকে না। বলতে যাওয়া মানেই ধৃষ্টতা।

কিন্তু অমিতা, এক প্রবল হবার কি সতিহি কোনো দরকার ছিল তোমার? তোমার প্রতিপক্ষ তো নেহাৎই দুটো ‘কাটা সৈনিক’।

ক্রমশঃ বুঝতে পারছি, ওই কাটা সৈনিক দুটোর মাটি দখল করে এক পাশে পড়ে থাকাও অসহ্য তোমার। অথচ সেই মাটি থেকে অন্য কোথাও ফেলে দেবারও উপায় নেই। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।

কিন্তু আমিই বা কী? আ! আমিই বা কী? আমি তো একবারের জন্তোও বলে উঠতে পারি না, অমিতা এ মাটিটা একদিন ওঁদেরই ছিল। তোমার চোখে এই সংসারটা যতই মূল্যহীন হোক, এটা ওঁদেরই বড় ভালবাসা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা।

আর ওহে নাক উচু মহিলা, তিল তিল করে আরো যে জিনিসটিকে তারা গড়ে তুলেছিল এবং তোমার পরমারাধ্য পিতৃদেব, থাকে তুমি এই কাটা সৈনিকদের থেকে অনেক উচুদরের মানুষ বলে মনে কর, সেই তিনি নিতান্ত বিনীত হয়ে এসে তার হাতে তোমায় তুলে দিয়েছিলেন অথবা বলতে পারো তার গলায় তোমায় খুলিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন অবশ্য তুমি প্রতিপদে সেই ‘গড়ে তোলার’ বস্তুটির অজস্র খুঁৎ বার করে চলেছ। তবু অস্বীকার তো করতে পারো না, এই কাটা সৈনিকরা তোমার বাবার দরজায় প্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়ান নি। প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তোমার বাবাই? কিন্তু তোমাকে কোনো কথা ‘মনে পড়িয়ে’ দেবার সাধ্য কার আছে? কে বলে উঠতে পারবে, ওহে নাক উচু মহিলা, এতো অহঙ্কারটি কেন তোমার? কেন তোমার নিজের সম্পর্কে এতো ওভার এস্টিমেট? তুমি কী তখন কোহিমুর হীরে?

বলে ওঠার কথা তো আমারই। আমার সভ্য শাস্তিপ্রিয় মা বাপ, এমন কথা বলে ওঠার কথা ভাবতেও পারেন নি, তাই-না দিনে দিনে ওই কাটা সৈনিকেরই ভূমিকায় গিয়ে পৌঁছেছেন। আমি একটা বুদ্ধু গাড়োল, আমি পয়লা রাস্তিরে বেড়াল কাটার থিয়োরিটা খেয়াল করি নি।

করি নি। এখন আর কিছু করার নেই। আগুনকে বাড়িতে দিলে, সে যখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তখন আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু গাড়োল আমি আগুনকে ফুলঝুরির ফুল ভেবে গুরুত্ব দিই নি। প্রথম সেই দিনটাই কথাই ভাবো অমিতা। তুমি তখন সবে এসেছ এ বাড়িতে একদম নতুন।

আমার বরাবরের অভ্যাস মতো মা আমার ভাত বেড়ে ধরে দিয়ে পাতে আমার নির্দিষ্ট নিয়মের মাখনের ডালাটি দিয়ে অভ্যাস মতো একটু গরম ভাত চাপা দিয়ে যাচ্ছেন, তুমি ও কী! ও কী! বলে এমন ভাবে শিউরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলে, যেন তোমার প্রিয়তম স্বামীর পাতে একটা কোলাব্যাঙ্ক লাকিয়ে পড়েছে।

মা ছেলে দু’জনেই হতভম্ব। কী হল। তুমি বলে উঠলে, অতখানি কাঁচা মাখন দিচ্ছেন?

মা তো জানেন না, ছিপছিপে গড়ন তিরতির মুখ তাঁর ওই হুন্দরী বধুমাতাটি কী বস্তু। তাই—হাস্তবদনে বললেন, এ খোকার বরাবরের অব্যেস। ভাজত পাতে বড় একটা ডালা মাখন চাইই চাই। ছোটবেলা থেকে।

কিন্তু বধুমাতা কি এই অমোঘ যুক্তিতে কর্ণপাত করলেন? পাগল! সে মালমশলায় তৈরী নন তিনি। তাই বলে উঠলেন, ‘চাইই চাই।’ চমৎকার! লিভারের বারোটা বেজে যেতে ক’দিন লাগবে? বলে ওই ব্যাঙ্ক পড়ার মতই মাখন সমেত থানিকটা

ভাত তাঁর স্বামী দেবতার পাত থেকে তুলে নিয়ে পাশে একটা বাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, দোহাই আপনার এ রকম আর দেবেন না ।

আমার তখন কী করা উচিত ছিল ?

আঁ্যা ! শালা বুদ্ধু মনোজ্ঞ, কী করা উচিত ছিল ? তোর এই অনেকের হিংসে উদ্বেককারী, দীর্ঘ স্ত্রীম মজবুত শরীরটার দিকে বোয়ের চোখ ফেলিয়ে, বলে ওঠা উচিত ছিল নাকি, বাল্যকাল থেকে তো চালিয়ে যাচ্ছি । লিভারের বারোটা বেজে গেছে মনে হচ্ছে ?

না, তা তুই বলতে পারলি না শালা । পয়লা রাত্তিরটায় তরোয়ালখুঁজে পেলি না । তোর অপ্রতিভ অপদস্থ মার মুখের দিকেও তাকাতে পারলি না । বরং কিনা বিজ-বিজ করে বলে বসলি, অবশ্য কাঁচা মাখন খুব খানিকটা খাওয়া উচিত নয়, ঠিকই । এই একটা ব্যাড হাবিট হয়ে গেছে আর কী !

তবে ? তবে আর এখন তুই অথকে দোষ দিচ্ছিস কেন শালা ?

এই স্বর্ণ স্মরণের দরজা খোলা পেয়ে গেলে, তোর জন্ম জন্মান্তরের গার্জেন, তোর যাবতীয় ব্যাড্ হাবিট উচ্ছেদ করার কাজে লেগে যাবে না ? আর উঠতে বসতে চারুওষ্ঠ বন্ধি করে ব্যঙ্গ হাসি হাসবে না তোর এ যাবতের জীবনের যত কিছু বোকামী গাঁইয়ামী আর কুসংস্কার দেখে দেখে ?

তুই শালাও তো তাতে মরমে মরে গিয়ে সকল প্রকার ব্যাড-হাবিট ত্যাগ করতে শুরু করলি ।

তোর মিষ্টি খাওয়ার একটা ব্যাড্ হাবিট ছিল, যার জন্তে তোর মার প্রতিদিনের কাজ ছিল, ছেলের জন্তে নানারকম মিষ্টান্ন তৈরী করা, সেটা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর । তুই বলতে শুরু করলি, মিষ্টি জিনিসটা হচ্ছে শরীরের পরম শত্রু । তোর ছিল যত কিছু তরকারির প্রতি আকর্ষণ, অবশ্য তোর বাবারও, তাই তোর মার রান্নাঘরে ছিল রোজই সমারোহ । একজন এনে সাপ্লাই করছেন, আর অপরজন কুটে বেটে রান্না করে পরিবেশন করছেন । নিত্য দিনের খাওয়াটাই ছিল যেন দৈনিক একটা আহ্লাদের অধ্যায় ।

পুত্র থালার সামনে বসে বলে উঠেছে, আজ তোমার কী কী অবদান মা ?

বাবা বিগলিত হাস্তে বলেছেন, তাকিয়ে দেখ । এই সাত সকালে একাহাতে মোচার ঘণ্ট, নারকেল কুমড়ি, আলুপোস্ত, মুড়ো দিয়ে ডাল ! খা বাবা ধীরে স্বস্থে, এখনো অফিসের দেরী আছে ।

একসঙ্গে পুত্রস্নেহ আর পত্নীপ্রেম, দুইয়েরই মধুর মোহন অভিব্যক্তিটি কুটে উঠেছে তাঁর মুখে । অতএব—পরদিন আবার নবীন উৎসাহে লাউ চিংড়ি, পুঁই হাঁচাড়া

আর পালা ঘণ্টার জোগাড়ে লেগেছেন।

হায় ! সেই আত্মাদের হাট আর ক'দিন বজায় থাকল, সংসারে আধুনিকতার হাওয়া প্রবেশ করার পর ?

অমিতা, তুমি আমাদের খাওয়ার পাতে জঙ্গলের সমারোহ দেখে মুহূর্তে মুহূর্তে যেতে শুরু করলে আর জঙ্গল অপসারণের কাজে লেগে পড়লে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তী তুমি, নিজের রইলে অন্তরালে আপাত নিষ্ক্রিয়। এই তিনটা পালা তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির আশায় এবং তোমার কাছে হয় হবার লজ্জায়, তোমার হাতিয়ারের ভূমিকাটি স্বেচ্ছায় তুলে নিল নিজের হাতে। অতঃপর ?

অতঃপর আমার ওই 'জঙ্গলগুলো' আর পেটে সহ না হতে থাকায়, রান্নাঘর দ্রুত জঙ্গলমুক্ত হয়ে গেল।

লজ্জায় ঘেরায়, আমার বাবা তাঁর একান্ত প্রিয় বাজার করার অভ্যাসটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে, নিজেও জঙ্গলে আসক্তি ত্যাগ করলেন।

অল্পবয়সী সংসারটা উন্নত হলো। কিন্তু অমিতা, তোমায় আর কী জিজ্ঞেস করব, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করি মাঝে মাঝে, আচ্ছা আমরা যখন অল্পবয়সী ছিলাম, তখন কি খুব দুঃখী ছিলাম ? আর এখন উন্নত হয়ে খুব সুখী ?

'লিভারের বারোটা বেজে যাবার' 'আশঙ্কায় কালে, কখনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি বলে তো মনে পড়ে না, কদাচ কখনো কিছু এদিক ওদিক হলে, ঠাকুরমার কাছে শেখা, মার দু-চারটে টোটকা জাতীয় ব্যাপারই যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু এখন ? এখন মাসে মাসে প্রেসার চেক করা কম্পালসারি হয়ে গেছে। অবশ্য তোমার স্বচাক ব্যবস্থাপনায় আর নির্দেশনায় এটি একটি হুশ্জালে চলছে।

আমার আর একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল প্রতিদিন সকালে একবার মার ঠাকুরঘরে (ঠাকুরমার আমলেরই ঠাকুর অবশ্য) গিয়ে একটা পেন্সাম হুঁকে আসা। আর পথে বেরোবার আগে, দালানের দেয়ালের টাঙানো কালী ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে একটু নমস্কারের মতো করা। এখন আমি সে সব থেকে মুক্ত। কারণ তোমার ঈষৎ বন্ধিম গুণের হাসিটা আমায় যেন অধোবদন করে দিয়েছে। এইভাবেই রূপান্তর।

এখন আমি পুরোপুরি একটি পালিত পশুর খোলসে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মালিকের মনটা কি পেয়েছি সত্যি ? তোমার অনেক অ্যাংগিশান। তুমি চট করে থামতে রাজী হবে কেন ? তুমি আমায় অবিরত অঙ্কুশ মেরে চলেছ তোমাকে সেই অ্যাংগিশানের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা কি কোনো থানে সীমায় ঠেকবে ?

আমার কোনো 'লক্ষ্য' নেই দেখে তুমি অবাক হও, মর্মান্বিত হও, 'উচ্চ আশাহীন'

পুরুষ মানুষকে তুমি অবজ্ঞা করে কুলিয়ে উঠতে পারো না ।

কিন্তু আমি অথবা আজকের আমরা কি সত্যিই একটা ‘পুরুষমানুষ’ ?

‘সুখী পরিবার গড়তে যাওয়া’ এই হাঁচের পুতুল আমরা, পুরুষও নই মানুষও নই, একটা ‘জীব’ মাত্র ?

তবে ? জীবমাত্রের আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কী ? একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তোমার তুষ্টিসাধন । জানি এখন তুমি যে ‘বাড়ির’ নেশায় মেতেছ, সে নেশাটা মিটলে, গাড়ির নেশায় মাতবে, সেটা মিটলে সর্বতোভাবে আধুনিক হবার নেশায় মাতবে, ছেলেকে যথার্থ ক্লান্তি করে তোলায় মাতবে আর তারপর বহুবিধ ব্যাধি আর বাতিকের শিকার হয়ে ডাক্তার আর চিকিৎসার নেশায় মাতবে ।

এর সবই জানি । শুধু তোমাকে জানানো যায় কি করে সেটাই জানি না ।

চিন্তা বাতাসের গতি, অফিসমুখী যানবাহনের জ্যামজটে আটকানো গাড়ির গতি কচ্ছপতুল্য । তবু একসময় দুটোই একটা দরজায় এসে থামে ।

দুজনেই সেই দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ে । মনোজ আর অমিতা । অনেকের ঈর্ষা আকর্ষণকারী একটি ‘লাকী’ দম্পতি !

দু’জনে এক দরজা দিয়ে ঢুকলেও, দুজনের চেয়ার তো আর পাশাপাশি নয় । ফের দেখা সেই টিফিনের সময় । আগে মনোজ বাড়ি থেকে টিফিন আনতো । অতএব অমিতাও কিছুদিন । কিন্তু নিত্যদিন লুচি আলু চচ্চড়িতেও তো লিভারের বারোটা বেজে যাওয়া অবধারিত । কাজেই অমিতা তার শান্তুড়ীর আরও একটা কাজ কমিয়ে দিয়েছে । এখন তারা অফিসক্যান্টিনে টিফিন করে ।

মনোজের ইচ্ছে ছিল না যে অমিতার সেই তখনকার আক্ষেপের ব্যাপারটা আবার খুঁটিয়ে তোলে, কিন্তু মনোজের তো একটা ভবিষ্যৎ চিন্তাও আছে, এখন যদি সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করে, ভুলে যাওয়ার ভান করে, পরের জন্ম সেই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণগুলি তোলা থাকবে না ? ছেলের শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগঠন, ভবিষ্যৎ এ বিষয়ে মনোজের কোনো চিন্তামাত্র নেই বলে ।

অতএব মনোজকে বলতেই হয়, ই্যা, তখন ই্যা, তখন কী বলছিলে তাতাইয়ের ব্যাপারে ?

অমিতা, একটা মশলা ধোসায় কামড় দিতে দিতে বলে, বলবার কিছুই নেই ।

তাতাইয়ের যা সর্বনাশ হবার, তা হয়ে গেছে ।

অনেক আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের ।

কী করেছে তাতাই ?

আমাদের ভোবাবার জন্তে যা কিছু করবার তা' করেছে। অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু এখন নতুন কী হলো ?

কী হল ? আমাদের স্ল্যাট কেনার কথা চাউর হয়ে গেল।

স্ল্যাট কেনা ! চাউর হওয়া।

মনোজ আড়ষ্ট মুখে বলল, এখনো তো কোথায় কী। পজিশন পেতে তো—

‘সেই তো। কোথায় কী !’ অথচ তোমার পুত্র রত্ন সেটি ঘোষণা করে বসেছেন।

আর শুধু কি তাই ? অমিতা এখন ধোঁসার বদলে চৌটে কামড় বসায়।

শয়তান ছেলেটা তোমার মা বাবাকে কী বলেছে জানো ? বলেছে, আমাদের নতুন বাড়িতে তোমাদের নিয়ে যাব না, কলা কলা। শুধু আমরা যাব।

অ্যা !

মনোজ সেকালের ভাষায় ‘পাংগুমুখে’ বলে, ঠুঁদের সঙ্গে এরকম—ঠুঁদের তো ভালইবাসে !

হ্যাঁ, ঠাকুমা ঠাকুর্দাকে যে মনোজের ছেলে খুব ভালইবাসে সেটা তো মনোজের অজানা নয়। এবং সেই ‘ভালবাসাটা’ নিয়েই যে সংঘাত, তাও অজানা নয়।

আসল জালা তো অমিতার ওখানেই। কোনো মতেই ‘নদীমুখ’ এদিকে ঘুরিয়ে ফেলতে পারছে না। অমিতার ছেলে অমিতার বিরোধীপক্ষের বশ হয়ে, তাদের কাছেই পড়ে থাকতে চাইবে, তাদের ভালবাসবে, এ জালায় তুলনা কোথায় ?

কই তাতাই তো তার মামার বাড়ির দিদাকে এতো ভঞ্জে না ? এই অমার্জিত চেহারা, গ্রাম্য মনোভাবযুক্ত, অশিক্ষিত ধরনের মানুষ, এরাই তাতাইয়ের প্রাণের আরাম।

এটাই তো জানা। হঠাৎ উন্টো স্বর কেন ?

কেন ?

অমিতা চাপা রাগের গলায় বলে, কেন আবার ? শয়তানী। মা বাপকে অপছন্দ করার ফন্দি ! শুধু কি ওই ? আরো কী বলেছে জানো ? বলেছে, কেন নিয়ে যাব ? তোমরা নোংরা বিচ্ছিন্ন বোকা গাঁইয়া। তোমরা আমার ‘কুশিকা’ দিয়ে দিয়ে বুদ্ধি খারাপ করে দিচ্ছ, লুকিয়ে আছে বাজে জিনিস খাইয়ে খাইয়ে আমার লিভার খারাপ করিয়ে দিচ্ছ, তোমাদের জালায় আমার ‘মাস্টারী’ একদিনের জন্তে হুখ পাগলনি, তোমাদের জালায়—

হাতের পেয়লা হাতে রেখে পাখর হয়ে যাচ্ছিল মনোজ, হঠাৎ ছিটকে উঠল, কী বলছ কী ? এই সব বলেছে ?

বলেছেই তো। আবার বলেছে, অত হুন্দর নতুন স্ল্যাটে তোমরা কী করে থাকবে

কুনি ? তোমরা তো নোংরা । দাঁহ ময়লা ময়লা লুঙ্গী গেঞ্জি পরে বেড়াবে, দিবা
সুচিবাই না কী যেন করবে, আর একগাদা ঠাকুর, আর গঙ্গাজল গোবর না কি,
নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে । তোমাদের আবার নিয়ে যাচ্ছি ! হাতী ! তোমরা এই পচা
বাড়িতে পড়ে থেকে হু হু করে কাঁদবে !

অমিতা !

মনোজ কপাল টিপে ধরে বলে, এসব কী বলছ তুমি, বুঝতে পারাছ না । ওকী হঠাৎ
পাগল-টাগল হয়ে গেল ?

হ্যাঁ ! পাগল হয়ে গেল ! আমাদেরই পাগল করে ছাড়বে তোমার ওই ছেলে ।

এক্ষেত্রে অবশ্যই ছেলে মনোজের ।

অমিতা ক্রমালে হাত মুছে মসলা কুচি মুখে ফেলে বলে, বিষের চারা চারাতেই
ওপড়াতে হয় । গোড়া থেকেই বলছি, কুশিক্ষার চাষ চলছে । স্কুলটা কাছে পড়ে, এই
ছুতোয় ওকে আমাদের ওখানে গড়িয়াহাটের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলাম, তুমি
বললে, ছেড়ে থাকতে পারব না । দেখছ তো তার পরিণাম ? আসলে তুমি
তোমার মা বাবা থাকতে পারবেন না ভেবেই, ওই কৌশল করেছিলে, আমি কি
আর বুঝিনি ?

মনোজ কি এখন বিরক্ত হয়ে চড়ে উঠবে ? বলবে, উল্টোপাল্টা কথা বলছ কেন ?
তাতাই তো ওঁদের বিরুদ্ধেই কথা বলছে ?

না, চড়ে ওঠবার সাহস নেই মনোজের । তাই অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু এসব কথা
তো ওঁদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে ?

যাচ্ছে ! ওই আনন্দেরই থাকো ! বিচ্ছু ছেলেটি জানে না যেন, যে, ওরা ভাববেন এ
কথা ওর নিজস্ব কথা নয় । শোনা কথা ! তাহলেই বোঝো অপদস্থতা কে হচ্ছে ?

মনোজ আরো অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু আমরা তো আর এ সব কথা—

বলিনি ঠিকই । তোমার ওই শয়তান ছেলেটি যে কথার হাওয়ায় বুঝতে পারে ।
আমার মা বলেন না, সেই যে বলে না উড়ে যায় পাখি, তার গুণতে পারে আখি ?
তোর ছেলেটা মিতু ঠিক তাই ।...এতোটুকু কখন কি বললে তাতে রং চড়িয়েছে ।
কিন্তু এসব কথা তোমায় বলল কে ? মনোজ প্রায় ভেঙ্গে পড়া ভাবে বলে, মা ? না
বাবা ?

অমিতা ঠোট ঝাঁকিয়ে বলে, ওঁরা বলতে যাবেন কোন মুখে ? খুব মিথ্যে কথা তো
আর নয় । গীতার মার গীতাটি নাকি সেখানে বসে পুজোর বাসন না কি মাজছিল,
সব শুনেছে । বলল এসে আমায় ।

মনোজের মনের মুখটা বলে উঠল, তা বলবে বৈকি ! ওটি যে তোমার গুপ্তচর জানি না আমি ? সারাদিনের সব কথা রিপোর্ট করে তোমায় ।

মনের মুখ তো সর্বক্ষণই কথা বলে চলে মাহুঘের । তাকে থামিয়ে রেখে বাইরের মুখেই কাজ ।

বাড়ি গিয়ে যে কী করে মুখ দেখায় তাই ভাবছি ।

আশ্চর্য ! তুমি কি প্রকাশ করতে বসবে, এ সব কথা তোমার কানে এসেছে ।

মনোজ অস্বস্তির গলায় বলে, তা ছেলেটাকে তো শাসন করা দরকার । করতে গেলেই—

সত্যি ! কী চমৎকার বুদ্ধি তোমার । ব্যাপারটা ওপন করলে, আর রইল কী ? যতক্ষণ না গিয়ে উঠছি ততক্ষণ আমি কাউকে জানতে দিতে চাই না । তোমার ‘হিতৈষী’ আত্মীয় জনের তো অভাব নেই । কে কখন তোমার মা বাবার দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়ে ভাংচি দিতে বসবে কে জানে ।

এখন অমিতার মনের ভিতরকার মুখ বলে ওঠে, তা ছাড়া, ওই মহিলাটির তো অনেক রকম । শনি মঙ্গল, মাহুলী কবচ, মানৎ টানৎ তুকতাক কত কী ! অবস্থাকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে আনতে, কিছু করে বসবে কি না বিশ্বাস আছে ?

মুখে বলল, খবরদার, ওসব কথার দিক দিয়েও যাবে না । আমি কালই তাতাইকে নিয়ে আমাদের ওখানে চলে যাব । ওখান থেকে স্থলে যাওয়া সুবিধা ভিন্ন অসুবিধের নয় ।

তাতাইকে নিয়ে হঠাৎ—মানে কী বলবে ?

কী আবার বলব ? ফোনে হঠাৎ মার খুব শরীর খারাপ শুনে—

মনোজ কী বলে উঠবে, বিষের চারা মানে কী অমিতা ? কুশিকা মানে কী ?

না, সে কথা বলে ওঠবার দুঃসাহস নেই মনোজের । কথা বলতে হয় নিক্তির ওজনে ।

বলল, তা তো বলবে, ছেলেটি আবার যা তুখোড় । হয়তো গিয়ে দেখে বলে বসবে, কই অসুখ ? তুমি মিছে কথা বলেছ ।

আচ্ছা, ওখানে গিয়ে কী হবে না হবে সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না ।

আমার মা তোমার মতন বুদ্ধি নয় । যেই আমি গিয়ে হৈ হৈ করে বলব, মা, তোমার এতো শরীর খারাপ, শুনে আমি ছুটে দেখতে এলাম আর তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ ? সেই বুকে ফেলে বললেন হঠাৎ খুবই খারাপ হয়েছিল রে । আজ একটু ভালো আছি । পরিস্থিতিকে নিজের মতোয় ভরে ফেলবার জন্তে কিছু বুদ্ধির দরকার বুঝলে ?

তা পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলে অমিতা ।

মায়ের হঠাৎ হার্ট ট্রাবলের জন্তে ডাক্তারের নির্দেশে ‘কমপ্লীট রেস্ট’ নিতে হচ্ছে বলে, অমিতাকে ওখানে কিছুদিন থেকে যেতে হয়েছে । ওখান থেকে অফিস যাওয়া আসা এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয় । তাতাইয়ের তো কোনো সমস্যাই নেই ।

অফিস যাচ্ছে ? তবে মায়ের কতটুকু কী উপকারে লাগছে ?

তা মেয়েটার উপস্থিতিই উপকার । নিঃসঙ্গতা নিবারণই ওষুধ । স্বামীটি তো তাঁর রাতদিন বিজনেসের উন্নতির খাঙ্কায় ঘুরছেন । তবে অমিতাকে তো আর গিয়ে মায়ের বাড়ির রান্নাঘরের ভার নিতে হয় না ! এমন ভাল পুরনো লোক আছে, তাকিয়ে দেখতে হয় না ।

সুচিবাইতো নেই, যে ‘যার তার হাতে খাব না, বিচার-আচার হানোত্যানো নিয়ে ঝগড়া করব ।

অতএব কিছুকালের জন্ত মনোজের মার কাজ আরো অনেক কমে যায় । প্রায় শূন্তের কোঠায় পৌঁছে যায় । শুধু যা মনোজের সকালের অফিসের ভাত । সেই সঙ্গেই দুটো মাল্লবের দুটো ভাত তরকারি হয়ে যায় । সন্ধ্যাবেলা তো মনোজ অফিস ফেরৎ ‘ওখানেই’ যায় অফিস থেকে বোয়ের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরে ; তো যতই হার্টের রুগী হোক, শাশুড়ী কি জামাইকে হাতে পেয়ে না থাইয়ে ছাড়বে ?

বেশী রাত করে এসে শুয়ে পড়ে থোকা, তার মা বাপের আর তখন ছেলের সাথে গল্প-গাছার উদ্দেশ্যে কথা বলতে সাহস হয় না ।

বড়জোর বাবা বললেন, ইয়ারে কেমন আছেন বোমার মা ? আর কতদিন ওখানে থাকবে ওরা ?

মনোজ বলে, ওদের কথা ওরাই জানে বাবা । তো ওদেরও তো একটামাত্র মেয়ে ।

মা বলেন, তাতাইটা বাড়ি না থাকলে বাড়ি যেন শূন্তপুরী, ভূতেরবাড়ি ।

মনোজ বলে, তা’কেন ! বরং বল যে ভূতের নেত্যাটি হচ্ছে না । বেশ তো রেপ্টে আছে বাবা ! থাকো না । খাটতে খাটতে তো জ্ঞান নিকলে যায় !

ই্যা, এইভাবে চালিয়ে চলতে হচ্ছে মনোজ নামক হতভাগ্য লোকটাকে । অনভ্যাসের দরুন ক্রমশঃই আর মায়ের কাছে বসে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলে উঠতে পেয়ে ওঠে না । লজ্জা করে । মা যদি বুঝে ফেলেন, বোঁ বাড়ি নেই বলেই, ছেলে সাহস করে তাঁর সঙ্গে সহজ হয়ে তাঁর কাছে এসে বসেছে !

না, সহজ হওয়া তো আর নেই ।

সহজের পালা অনেকদিন ঘুচেছে মনোজের । কোন্ কথাটা বলবে, আর কোন্ কথাটা বলে ফেলবে না, তা ভেবে উঠতে না পেয়ে ‘হী, না, আচ্ছা, ঠিক আছে,

এই দিয়েই চালায় ।

তাছাড়া ঔরাও তো ক্রমেই নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে চলেছেন ।

ঔরাও তো ভয় পান, কোন কথা থেকে কোথায় না জানি মান সম্মানে গিয়ে আঘাত লাগে !

চিরকালই ‘বাজারদরটা’ হচ্ছে মনোজের বোকা-সোকা বাপটির সব থেকে প্রিয় প্রসঙ্গ ।

বরাবরই বাজার থেকে ফিরে কিছুক্ষণ সেই প্রসঙ্গ চালানোই তাঁর অভ্যাস !

অবিবাহিত পুত্র আর তার জননীটি কর্তার কান বাঁচিয়ে হাসাহাসি করছে । ওই হলো আরম্ভ । এখন বসে বসে শোনো, প্রতিটি জিনিসের দর কীভাবে আকাশে উঠে চলেছে ।

বাবা বলেছেন, তা’ স্তনতে হবে না? জানতে হবে না? কাঁচালঙ্কার কিলো কুড়ি টাকা, স্তনেছো কখনো ?

মা অবলীলায় বলেছেন, আমার জেনেও কাজ নেই স্তনেও কাজ নেই, ও তোমার একশো টাকা কিলো হলেও দৈনিক একমুঠো করে কাঁচালঙ্কা আমি খাবোই !

এখন না কি মা আর কাঁচালঙ্কা খায় না । স্তনি নাকি খেলে বুক জালা করে । হয়তো সেটা সত্যিই, কারণ কাঁচালঙ্কার মধ্যে তো সে গুণ বিद्यমান আছেই ।

কিন্তু মার এই বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্মত বর্জনের পিছনে কী শুধুই কাঁচালঙ্কার ওই গুণটিই বিद्यমান ?

সাহস করে মাকে জিজ্ঞেস করতে যাওয়া যায় না ।

অমিতা বলে, নাকি, তুচ্ছ কথাকে উচ্চ করে তোলা তোমাদের এই বাড়িটির এক স্বভাব ।

কবে বুঝি তাতাই বলেছিল, রোজ এতো গাদাগাদা কাঁচালঙ্কা খেয়ে খেয়ে তুমি একদিন মরবে দিদা ।

দিদা বললেন, ‘কাঁচা পাকা কোনো লঙ্কা না খেলেও মরবই একদিন ।’ তা’ বাচ্চা-ছেলে সর্বদা যা শোনে, তাই বলে ফেলে । বলেছে, আর কাঁচালঙ্কার যে এত দাম, তার বেলা?

সেই তুচ্ছ কথাটা নিয়ে—ভাবা যায় না । যেখানে একটা বাচ্চা ছেলের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বেড়ানো হয়, সেখানে বাস করাকত দুর্ভাগ্য তা’ ভেবে দেখেছ ? বহু কথাই ভেবে দেখবার অনুরোধ আসে মনোজের কাছে । অথচ ভেবে দেখাটাতেই মনোজের আতঙ্ক ।

ভেবে দেখলে তো বলে উঠতেই পারতো ছোট কথা যে, বড় করে ভাবার ব্যাপারে আমার মুখ্য মা, তাঁর গ্র্যান্ড্যুয়েট বোনের কাছে শতশতাধি হেরে যাবেন অমিতা ।

বাবার সেই প্রিয় প্রসঙ্গটিও তো বাবা ত্যাগ করেছেন। তাতে তো বাবার বুকজ্বালা করার প্রশ্ন ছিল না? অথবা ছিল। অমিতা সেই একদিন ওই প্রসঙ্গের মাঝখানে হঠাৎ বলে ওঠে নি তুমি, ওসব আর আপনার ছেলেকে শুনিয়ে কী হবে বলুন? যদিও তার বেশী দেওয়া তো আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়? শুনে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল অমিতা। আর আমি তার প্রতিবাদ, মাত্র না করে, না শোনার ভান করে ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসেছিলাম। একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলাম তোমার কাছে। আড়ালে বলেছিলাম, বাবার তো ওই বাজার দর নিয়ে হা-হতাশ চিরকালের রোগ, হঠাৎ ওভাবে কথাটা বলতে গেলে কেন?

তুমি একটুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, ‘খোকা’ নামটিই তোমার সার্থক নাম। অবশ্য সবসময় সব কথা তোমার কানে আসে না। প্রতিনিয়তই তো আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ওই হা-হতাশ চলে। আমি তার মানে বুঝি না? নিজের পেনসনটি নিয়ে যে কী করেন গড্ নোজ্। ঠাকুরের মিষ্টিই আসছে রাতদিন।

তবে? ‘ছোটকথা’র মানে জানো না তুমি?

মাঝেমাঝে মনে হয়, মার সেই সদা-হাস্তময়ী আহ্লাদে ভাসা মূর্তিটা কোথায় হারিয়ে গেল? কোথায় গেল সংসারের সেই সরসতা, অকারণ কোঁতুকের সূঁচ। মার তো কথা বলার ভঙ্গীই ছিল কোঁতুকের। আমারও কম নয়। আর বাবাকে নিয়ে কোঁতুক করাটা আমাদের মাতাপুত্রের ছিল একটা নির্মল খুশীর উৎস।

সেই সরসতা, সেই অকারণ কোঁতুক, বাড়িতে কেউ এলে আহ্লাদে ঝলমলিয়ে হাসি গল্প সব হারিয়ে গেছে। এখন মল্লভূমিতে গুয়েসিস, শুধু তাতাই। কিন্তু সে তো জীবনের বনেদ নয়! আমাদের জীবনের বনেদ থেকে, সেই অকারণ পুলকের পিলারগুলো ভেঙে পড়েছে।

এখন সংসারটা যেন একখানা ভারী পাথরের মত সকলের মাঝখানে চেপে বসে আছে।

অকারণ কোঁতুক, অহেতুক উল্লাস, এসবের নির্বাসন ঘটেছে এবাড়ি থেকে।

পরিহাস পরিপাক করবার ক্ষমতা তোমার হৃষ্টিকর্তা তোমায় দেননি অমিতা। পরিহাসকে ভাবো উপহাস, কোঁতুককে ভাবো ব্যঙ্গ। অতএব আমার স্বভাবটা পান্টাতে হয়েছে। স্বভাব জিনিসটা যে মরেও পান্টায় না। এ প্রবাদটাই ভুল। পান্টায়। আমূল পান্টায়। আমাদের মতো মেরুদণ্ডহীনদের আত্মোপাস্ত পান্টে যায়।

ম্রিয়মান এক প্রৌঢ় দম্পতির কাছ থেকে প্রায় পালিয়ে এসেই অনেকক্ষণ এই হতাশা আর অপরাধ বোধের শিকার হয়। তবে উপায় কি? একদা ‘পতিব্রতা

পত্নী' ছিল আদর্শ, এখন যদি বশব্দ পতিই আদর্শ হয়, হতেই থাকবে।

হঠাৎ একসময় শূণ্ণশয্যা যেন একটা অস্থিরতা এনে দেয়। অকারণ এতোগুলো দিন মিতাকে আর তাতাইকে ছেড়ে থাকতে হবেই মনোজ হতভাগ্য। নিত্য দেখা হয় ঠিকই, তবু রাত্রে শূণ্ণ শয্যা, শূণ্ণ ঘর বড় যন্ত্রণাদায়ক।

উঠে জল খায়, পাখার স্পীড বাড়ায়, এবং প্রতিজ্ঞা করে, নাঃ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফ্ল্যাটটায় পজেশন পাবার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে থাকা যায় না। অমিতার যখন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ওখান থেকেই নতুন বাড়ি চলে যাবে। ছেলেকে আর দূষিত পরিবেশে নিয়েও আসবে না।

অমিতার মা অবশ্য এই নির্লজ্জ ঘটনাটিকে একটি 'কালার' দেন, বলেন, নিজের সংসার হলে, আর তো মিতু নিজের ঘর গেরস্থালী ফেলে আমার কাছে এসে দশবিশদিন এমন নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারবে না? পেয়ে নিই ওকে একটু।

ও মা!

মিতু আহ্লাদে গলায় বলেও ওঠে, পেয়ে নেওয়াটা আমি ছাড়বো নাকি? তখন তোমাকে তোমার ঘর গেরস্থালী ছেড়ে আমার কাছে গিয়ে থাকতে হবে না?

শোনো মনোজ মেয়ের কথা।

মনোজের দাঁতের আগায় একটু হাসি ঝুলে পড়ে। অমিতা বলে দেখো হয় কিনা। দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতিকে সরস আর আহ্লাদে করে তোলবার ক্ষমতা অমিতার নেই তা নয়।

তবে আর কী করা?

এই আলো ঝলমল পরিবেশে গা ভাসিয়ে দেওয়াই আরামের।

ভবানীপুরের বাড়ির সেই কম পাওয়ারের আলোওলা খাবার ঘরে সাধারণ সান-মাইক পাতা একটা শ্রীহীন টেবিলে শীর্ণ ত্রিযমান প্রায় নীরব মার কাছে বসে রুটি তরকারি খাওয়ার ছবিটা মনে পড়লে ভয় করে মনোজের।

তবে সমস্যা—তাতাই।

প্রতিদিন সে বাপীর সঙ্গে বাড়ি যাব বলে কাঁদাকাটা, রাগারাগি চালিয়ে যাচ্ছে। বলছে তোমাদের নতুন ফ্ল্যাটে আমি যেতে চাই না। আমি দিদার কাছে দাঁড়র কাছে থাকব।

মূর্তিটা তখন তাতাইয়ের হিঙ্গ্র লাগে। তাতাইয়ের এই ভয়ংকর মূর্তি দেখেই তো আরো একদিনের জন্তেও পাঠাতে রাজী হয় না অমিতা। আড়ালে গুর মাও বলে, খবরদার না। দেখছিস না মূর্তিটা ছেলের। নির্ধাৎ বশীকরণটরন কিছু করা হয়েছে।

এটা অবশ্য শুনতে পায় না মনোজ্ঞ তবে জোর করতেও সাহস করে না। যদি জেদী একগুঁয়ে রাগী ছেলেটা আর আসতে না চায়।

বড্ড কিছু করলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসাটা তো লজ্জার। কোন্ মুখে সেটা কববে মা বাবার সামনে!

আবার ছেড়ে দিলে, কোন্ মুখে খালি একা গিয়ে দাঁড়াবে অমিতার ‘ও বাড়িতে।’ কোন্ মুখে বলবে, আসতে চাইল না। ওরা ধরে নেবে, এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ব্যাপার।

উঃ। উঠে পড়ে লেগে, ক্ল্যাটটায় গিয়ে পড়তে পারলে হয়।

তবু একদিন মনোজ্ঞ ছেলেকে একটুকুণ একা পেয়ে বলেছিল, এতই যদি ইয়ে তা সেদিন দাছু দিদাকে বলেছিলি কেন, আমাদের নতুন ক্ল্যাটে তোমাদের নিয়ে যাব না। তোমরা নোংরা বিচ্ছিন্ন।

তাতাই লাল লাল মুখে বলেছিল, সে তো মজা করে।

মজা করে তুমি খারাপ খারাপ কথা বলবে? জানো এই জুতেই দাছু দিদা তোমার ওপর রেগে গিয়ে তোমায় আর পচা বাড়িতে থাকতে হবে না বলেছেন, বলেই তোমার মাম্মী তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে।

তাতাই একটুকুণ বাপের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে, তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ।

মনোজ্ঞ কি ওই তীব্র তীক্ষ্ণ টর্চের মতো দৃষ্টির সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যাবে? যেতে পারলে হয়তো ভেতরে এমন যন্ত্রণা কুরে কুরে খেত না মনোজ্ঞ নামের লোকটার।

কিন্তু পালিয়ে যাওয়া তো চলে না।

তাই আবার বলতে হয়, কেন বানিয়ে? অত খারাপ কথা শুনে দাছুদের অপমান হতে পারে না?

তাতাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল, তুমি খাও, তুমি চলে যাও। এক্ষুণি চলে যাও সেই পচা বাড়িতে। আমি আর কখনো যাব না।

হ্যাঁ, এতে কার্খসিদ্ধি হয়েছে বটে মনোজ্ঞের। সেদিন থেকে আর একবারও বাড়ি যাব বলে বায়না করে নি তাতাই। কিন্তু মনোজ্ঞ?

হ্যাঁ, শিশুকে প্রবঞ্চনা করার যন্ত্রণা যে খুবই যন্ত্রণাদায়ক, তাতে সন্দেহ কী! এর নামই কি বিবেকের কামড়?

তা সে যন্ত্রণা আর কদিন থাকে আপাত শান্তিপ্রিয় লোকদের?

দেখা গেল সেই আপাত শান্তিটা এসেছে। তাতাই আর বাবা বাড়ি ফেরার সময় কাছে এসে বুলে পড়ছে না। শেষ অবধি বিদায় দিতে অমিতা একাই গেট অবধি

আসছে। তাতাইয়ের নাকি তখন ভীষণ ঘুম পেয়ে যায়। যাকগে ভুলে যাবে।
শিশু তো দু'দিন বাদে ভুলে যাবে। এখন তো স্বস্তি। ও কি আর পরে ভেয়িকাই
করতে যাবে, কে কী বলেছিল বলে?

এইভাবেই তো 'স্বথ' কেনা। ক্ষুদ্রতা দিয়ে, তুচ্ছতা দিয়ে, ছোট বড় মাঝারি নানা
মাপের মিথ্যাচার দিয়ে, বিবেকের কামড়কে সয়ে নিয়ে নিয়ে।...কত মিথ্যার জাল
রচনা করে করে অমিতাও তো তার জীবনের স্বথটুকু কিনতে পারছে।
অমিতাও ছন্দার মতো, রেখার মতো, একটা সত্যিকার জীবন পাবে, এ স্বপ্ন সম্বল
করতে কিছু খানিকটা বিকোনা যায়। শ্রমের বদলে প্রেম, এ তো চলছেই।
মনোজকেও তো শুধু ছোটই নয়, বড় কিছুও বিকোতে হয়েছে। মনোজের যা
আয় তাতে কি আর সন্টলেকের সেই ছবির মতো ক্ল্যাটটি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল?
মনোজ মনকে ঠিক দিয়েছে, যা সবাই করছে, করে পার পাচ্ছে, তা মনোজই বা না
করবে কেন? সততা শব্দটার কি আজকাল চল আছে?

অমিতার মা অবশ্যই বেশ আধুনিক, কিন্তু অমিতার 'বাপী' (যিনি একদা বাবাই
ছিলেন, এখন বাপী হয়ে গেছেন) তিনি ধূয়ো ধরলেন, দিনক্ষণ পাজী-পুঁথি দেখে
গৃহপ্রবেশ করতে হয়। ক্ল্যাট বাড়িতে তো আর ভিৎপূজা হয় নি। অতএব আবার
কিছুদিন অপেক্ষা।

কিন্তু অমিতার ভাগ্যের শনি যে এই ভাবে শত্রুতা সাধবে, কে জানে তো?।
অবশ্য এমন নাটকীয় ঘটনা তো অহরহই ঘটে চলেছে বিশ্বসংসারে। নতুন আর
কি?

এখন আর ক্ল্যাটটাকে লুকিয়ে রাখা চলে না। তাই অমিতাই বলে বলে মনোজকেই
বধ্যভূমিতে পাঠায় হাড়িকাঠে গলা দিতে। 'বলবে, আস্তে আস্তে বলবে।'

এখন আর বিদায় বেলায় তাতাই আর গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসে না বলে অমিতা
একা পায় মনোজকে। বলবার স্রবিধে। অফিসে সে ছুটি নিয়ে বসে আছে কদিন
নতুন বাড়ির সাজসজ্জার জন্তে মায়ের সঙ্গে কেনাকাটায় বেরোতে।

গেটের ধারটা ছায়াছায়া।

মনোজ বলল, আর পারা যাচ্ছে না। রাস্তিরে বিছানাটা ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

অমিতা বলল, আমারই যেন কিছু হয় না। কেমন?

তোমার কাছে তবু তাতাই থাকে।

আর বোলো না—সে তো আবার আজকাল পাকামি করে ক’দিন দাড়াইয়ের কাছে শুচ্ছে। দাড়াই নাকি শুকে গ্যালিভরের গল্প শোনাচ্ছেন। দাড়াইয়ের ঘরে।

হঠাৎ ধক করে উঠলো মনোজের। একদিন চারুলতার কাছে গল্প শুনতে শুনতে তাতাই ‘দিদার কাছে শোব’ বলে বায়না ধরেছিল। ওঁরা বলেছিলেন ‘খাক না বাবা, এত এমন করছে।’

কিন্তু একটু পরে মনোজকেই এসে, হাত পা ছোঁড়া অবস্থায় ছেলেকে ধরে নিয়ে খেতে হয়েছিল, ‘ছেলে ছেড়ে ওর মা ঘুমোতে পারছে না’ বলে।

ছেলে ছেড়ে ঘুমোতে পারে না অমিতা মনোজের জানা। পারে, এটা অজানা।

তা মনোজের জানার বাইরে কত অজানা বস্তুই তো আছে। মনোজ তাই ছেলের ‘পাকামি’র কথা শুনে শুধু বলল, ‘তাই বুঝি’।

ভদ্রতা, সত্যতা আর পায়ের তলার মাটি বজায় রাখতে পুরুষ জাতকে এমন কত কিছুকেই শুধু ‘তাই বুঝি’ বলে আলগা হয়ে ছেড়ে দিতে হয়।

সবসময় যদি ‘জোঁকের মুখে হুন’ দেবার চেষ্টা করতো, তাহলে আর যাই হোক সংসার করা হতো না তার।

অমিতা বলল, ই্যা। থেয়ালের ওপরই তো চলে তোমার ছেলেটি। যাক যা বল-ছিলুম, একেই তো বাপী ওই এক পাঁজীপুঁথির ব্যাপারে ফ্যাচাং তুলেছে, আবার এখন বলছে ‘গৃহ প্রবেশের সময় তোর শ্বশুর শাস্ত্রীকে একবার আনা উচিত।’ নইলে নাকি শুভ লক্ষণ হবে না। আবার নাকি লোকে নিন্দেণ্ড করবে। অথচ মা বলেছিল, একটু সাজিয়ে শুছিয়ে ব্যবস্থা করে, তবে একদিন ওঁনাদের নিয়ে যেতে। গেলে নাকি একটা রাত বাস করতে হয়। বাপী না এতো সব মেয়েলীপনা জানে। হি হি, নিজের যোগেশ ওঁন্টার ভয়ে সব সময় পাঁজীপুঁথি শুভ-অশুভের কারবার। তা বাপী যখন বলেছে, তখন না করিয়ে তো ছাড়বে না। আজ সবটাই শুনিয়ে খুলে বলে, ওটাও বল গিয়ে। মনোজ কল্পনা করে নিল, ওই প্রস্তাবটা নিয়ে ও মা বাপের সামনে পেশ করছে।

ভীষণ রাগ হলো মনোজের।

ওঃ বটে। তোমার বাপীটি যখন ধরেছেন, তখন না করিয়ে ছাড়বেন না। আমি শালা তোমার ফরমাস খাটার চাকর।

বলতে মুখে আটকালো না ? মা বাবাকে আমি—

তবে রাগ চাপাই বশব্দ স্বামীর কর্তব্য। তাই খুব নরম গলায় বলল, আমার মনে হয়, এটা তোমাদের নিজের গিয়ে বললে ভালো হয়।

দপ্ করে জলে উঠল অমিতা ।

বলল, কেন, তোমার সাহস হচ্ছে না ? তুমি ছেলে, তুমি বলতে পারবে না, আমাকে গিয়ে বলতে হবে ? আচ্ছা, কেন যে তুমি এতো নার্ভাস, তা জানি না । আমার পক্ষে গিয়ে বলা সম্ভব নয় । যদি কথা না রাখেন, আমার মানটি কোথায় থাকবে ভেবে দেখেছ ?

কোথায় থাকবে, সে উত্তর দিতে পারল না মনোজ । অতএব তাকে রাজী হতেই হলো ।

অমিতার মান চলে যেতে পারে, এমন ঘটনা তো ঘটানো যায় না । তবু—কী ভাবে বলা যায়, সেই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে অতঃপর বিদায় নিল মনোজ । অনেক রাত হয়ে গেল আজ !

কত রাত হচ্ছে আজ খোকার । অস্থির হয়ে ছটফট করছেন চারুলতা । শুক রাত সারা পাড়া নিঃশ্বাস ।

গীতার মার গীতাটা দালানের কোণে নিজের বিছানাটি পেতে শুয়ে পড়েছে । তাকে দিয়ে কী বা হবে ?

শোবার আগে সে একবার কর্তব্য করে জিজ্ঞেস করেছে, তোমরা থাকেনি ? মেশো-মশায় তো শব্দর বাড়ি থেকে খেয়েই আসে ।

চারুলতা সংক্ষেপে বলেছেন, তোর দাদুর শরীর ভালো নেই ।

তো তুমিও থাকে না ?

না ।

কি হয়েছে দাদুর ?

বুক ব্যথা করছে ।

বুক ব্যথা । 'তা' একটু স্থান ঘোষান খাইয়ে জাও । ভালো হয়ে যাবে ।

বলে শুয়ে পড়েছে সে । তা' সেও অনেকক্ষণ । ছেলেটা এত দেবী করছে কেন ? কী হলো ! তারই বা কী হলো ? তাতাইটা ভালো আছে তো ?

স্বামীর জ্ঞাত ভাবনাটা দশগুণ বেড়ে যাচ্ছে ছেলে আর নাতির চিন্তায় । অস্থ-বিস্থ করেনি তো তাতাইয়ের ? রাস্তায় খোকার কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো ? যা গাড়িটারির অবস্থা আজকাল ! এদিকে অবিনাশ মাঝে মাঝে উঃ আঃ করছেন, উঠছেন, জল খাচ্ছেন আর 'খোকা এখনো এল না ?' বলে আবার বুক হাতটা চেপে শুয়ে পড়ছেন ।

চারুলতার মনে হচ্ছে হঠাৎ তাঁকে কিছুতে একটা গ্রাস করতে আসছে । চারুলতা

যেন কোথা থেকে কী একটা সংকেত পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, এই গভীর হয়ে আসা রাজ্যের স্তব্ধতা, এই চারিদিক নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া, অবিনাশের এই এক আচ্ছন্ন ভাব, যে রকমটা আগে কখনো দেখা যায় নি। এ সমস্তই যেন ভয়ানক একটা অন্তিমবাহী !

ছেলের ওপর দ্রুত একটা রাগ অভিমান হচ্ছিল এতক্ষণ, ভাবছিলেন, এসে দাঁড়ালেই বলে উঠবেন, ছি ছি থোকা, তুই এমন হয়ে গেলি ? এত অপদার্থ ?

একবারও ভেবে দেখতে হচ্ছে হয় না, কী ছিল তুই আর কী হয়েছিল !

ঘোরঘোর আচ্ছন্ন হয়ে থাকা স্বামীর কাছে শুধু গায়ে হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না চারুলাতা। মাঝে মাঝে শুধু ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন, ঘাম হচ্ছে না তো ? বেশী ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?

গাটা যদি জরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, তাহলে বুঝি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন চারুলাতা। জ্বর এলে এমন অঘোর ভাবটা বরং স্বাভাবিক।

কিন্তু কই ? গা তো ঠাণ্ডা পাথর ! থোকা না ফেরা পর্যন্ত ডাক্তার ডাকার কোনো উপায় নেই।

একবার ভাবলেন, গীতাকে ডেকে কি একবার স্নেহিতবাবুর বাড়ি খবর পাঠাবেন ? ওদের ফোন আছে, যদি কোনো ডাক্তারকে—

ভাবছেন আবার পিছিয়ে যাচ্ছেন। রাত এগারোটায় পড়শীর ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তার ডাকার মতো কিছু না হয় যদি। যদি তারা বিরক্ত হয় ?

কিন্তু থোকা যদি সেই মুহূর্তে এসে পড়ে ?

সে কি নিজের অপরাধটার কথা একবারও স্বীকার করবে ? না, মার অসহায়তার কথা বুঝবে ? যে মাহুষটার ওপর নির্ভর করে জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চারুলাতা, সেই চোন্দো বছর বয়েস থেকে এই চুয়ান্ন বছর বয়েস অবধি ! সে মাহুষ চোখ বুজে পড়ে রয়েছে আচ্ছন্ন মতো। চারুলাতার জীবনের সেই ভিৎটা যে কৈপে উঠছে। এ সব কথা বুঝতে চেষ্টা করবে থোকা ?

করবে না। এখন আর মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে না সে ! অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে। বরং নিজের অথবা বোয়ের ঐদাসীন্ত অবহেলা আর নিলজ্জতার পাল্লাটা ভারী হয়ে উঠতে দেখলে, মার পাল্লায় চাপিয়ে ফেলছে কিছু ঢিল পাথর ভাঙা ইট।

মা অসহিষ্ণু, মা অর্ধেক, মা অবোধ, মা বিবেচনাহীন ! মা যদি কখনো ছেলেকে ‘নিজের লোক’ ভেবে নিজস্ব কিছু দুঃখ বেদনার কথা বলতে চেষ্টা করেছে কান পেতে শুনতেই চায় নি থোকা। ‘তোমার এসব ধারণার কোনো মানে হয় না’

বলে দুঃখটাকে ‘কাল্পনিক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে ।

চারুলতা নামের মানুষটা অহরহ অকারণ অপমান, অকারণ নির্মমতায়, নিঃশব্দে তিলে তিলে ক্ষয় হতে হতে যে সব জোর হারিয়ে ফেলতে বসেছেন এ সত্য স্বীকার করবার সাহস আর ওর নেই । চারুলতার ওই রূপান্তরিত ছেলোটর । তাই মাকেই বলে ওঠে, তোমার ভুল, তোমার অগ্রায়, তোমার নিজের মন থেকে তোলা দুঃখ । এখনও তাই করবে ।

রাত করে বাড়ি ফিরে যদি দেখে মা পাড়ার লোকের সাহায্যে ডাক্তার এনেছে, নিজের অপদস্থ হওয়ার মানিটা মুছে ফেলতে, বেগে বলে উঠবে, এর কোনো মানে হয় না । একটু বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে । পাড়ার লোককে ঘুম ভাঙিয়ে জ্বালাতন করবার মতো কী এমন হয়েছিল ?

হ্যাঁ, সেই নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে চারুলতা গীতাকে ডেকে তুলে পাড়ার লোকের শরণাপন্ন হতে সাহস করছেন না ।

তাই এই আধ ঘুমন্ত মানুষটার গায়ে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে ভেবে চলেছেন ।

‘বুকের পাটা’ বলে নাকি একটা শব্দ আছে চলতি বাংলায় ।

চারুলতা কখনো সে শব্দটাকে জানেন নি । চারুলতা চিরকাল শুধু সঙ্কলকে ভয় করে এসেছেন । আর সকলের মন রক্ষা করবার চেষ্টা করে এসেছেন । ‘শান্তুড়ীর বো’ থাকাকালীন অবস্থা থেকে ‘বোয়ের শান্তুড়ী’ হওয়া পর্যন্ত একই পদ্ধতি চারুলতার ।

এখন চারুলতা ‘বুকের পাটা’ শব্দটার মানে বুঝছেন, বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দেখে দেখে অহুভব করছেন, ‘বুকের পাটা’ মানে কী !

তবু নিজেকে সে ‘পাটা’টাকে সংগ্রহ করে এনে বুকের মধ্যে বসিয়ে তাকে মজবুত আর শক্ত করে তুলতে পারবেন, এমন ক্ষমতা নেই ।

কতবার ভাবছেন, থোকা রাগ করে, বয়েই গেল । মুখের ওপর বলে দিতে পারব, ‘তোমার খন্তরবাড়ি লীলা’ সাক্ষ করে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মানুষটা যদি মরে যেত ?

ওই ভাবাই সার ।

এ ভয়ও তো আছে, যদি ডাক্তার এসে বলে ‘কিছুই হয় নি ।’ তা’হলে ? তাহলে তো সবটাই ধাষ্ট্যমো ।

ভগবান ! ছেলের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে আমি ঠিক করছি না ভুল করছি ?

স্বামীর চোখ বন্ধ, মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না চারুলতা, অজ্ঞানিকে তাকাচ্ছেন । থোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন । ওই আকাশটার মধ্যেই বুঝি

অভয় আর আশ্রয় !

আচ্ছা, ঠিক কখন শরীরটা খারাপ হলো অবিনাশের ? হুপুয়ে তো ঠিকমতই ভাত খেয়েছিলেন । বাজারেও গিয়েছিলেন সকালে । বলেছিলেন, ভালো শাঁতরাগাছির গুলপেলায়, নিয়ে এলাম খানিকটা । আগের মতো নারকেল কোরা আর মটর-ভালের বড়া দিয়ে রেঁধো তো কাল ।

চারুলাতা মনঃক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন, এত তরিবৎ করে রাঁধব, কে বা থাকবে ! খোকাটা হুঙ্কু কবে থেকেই এসব ছেড়ে দিয়েছে ।

অবিনাশ একটু হেসেছিলেন ।

বাঃ ! আমরা বুঝি আর মানুষ নই ? আমরাই খাব ।

তারপর একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এখনো খোকানামকাওয়াস্তে একটা বেলা দুটো খাচ্ছে, এরপর তো সেই তুমি আর আমি । বুড়ো আর বুড়ি ।

এই একটা যন্ত্রণা এই মানুষটাকেও জীর্ণ করে ফেলেছে । ওরা আর এখানে থাকবেনা । ওর এই বাসাটাকে খড়কুটোর মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে নিজের তৈরী নতুন বাসায় ।

যাক, যেখানে থাকুক, ভালই থাকুক, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এমন সত্য সত্যীনের মতো ব্যাভার করছে কেন বল তো চারু ? কেন এতদিন আগে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল ! একবার আমাদের দেখতে পর্যন্ত দিচ্ছে না ? আমরা কি ওদের ছেলেকে কেড়ে নেব ? আটকে ফেলব ? সে ক্ষমতা আছে আমাদের ? আর ওর বাসা ? নতুন বাসা সেও কি খেয়ে ফেলব আমরা ? এতো লুকোছাপা কেন ?

এতো লুকোছাপা সত্ত্বেও, খোকার নতুন বাসার খবর তো জানা হয়ে গেছে এঁদের ।

তাতাইয়ের সেই উদ্ঘাটনের পরদিনই তাতাইকে নিয়ে চলে যাওয়া, আর তাকে দেখতে না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে আর অস্ববিধে হয় নি । খোকা বাসা করছে, দেড়লাখ টাকা দিয়ে ছবির মতো ফ্ল্যাট কিনছে । অতঃপর তো এ, ও, সে, বলছেই এসে এসে ।

ওমা । সে কী ! ছেলে ফ্ল্যাট কিনেছে, তোমরা জানো না ?

এই না জানাটা যে কী মর্যাস্তিক লজ্জার—তা যারা বলে হয়তো জেনে বুঝেই বলে । মর্যাস্তিক দৃশ্যটা উপভোগ করতে ।

চারুলাতা কি অবিনাশ গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছেলের বোয়ের নিবন্ধ পশরা খুলে বসেন ? আর ‘ভেড়া’ বনে যাওয়া ছেলেকে ধিকার দিতে থাকেন ? তা’হলে হয়তো ওই শুভানুধ্যায়ীদের করুণা পেতে পারতেন । কিন্তু এঁরা তা না করে ছেলে বোয়ের

দোষ ঢেকে প্রেষ্টিজ বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। বলেন, ওমা জানব না আবার কেন ? তবে বেশী উৎসাহ দেখালে যদি বলে বসে, তোমরাও চলো সেখানে ! বাবা তাহলেই তো গেছি।

ঝুনোরা অবশ্য মনে মনে হেসে বলে, তা আর বলেছে ! এখনকার বৌ-কিরা স্বাধীনতা চায় !

চাকুলতার উক্তি, তা চাইবেই তো ভাই। যেকালে যে ধর্ম ! আমার এই ‘গোবর গন্ধাজল’, ঠাকুর-ঠুকুরের সংসার। ওরা তো প্রাণ খুলে নিজেদের মনের মতো করে থাকতে পায় না বাপু !

এরপর আর কী বলতে পারে তারা, আড়ালে হাসা ছাড়া ?

‘দ্রাক্ষাফল অতিশয় অল্প’ এ গল্প তো জীবনের প্রারম্ভেই জানা।

নিজেদের মান সম্মান বজায় রাখতে ছেলে বোয়ের দোষ ত্রুটি চাপা দিয়েই চলেন চাকুলতা। কখনো চান না উদ্ঘাটিত করতে। কিন্তু যখন উদ্ঘাটিতটা অবধারিত, তখনো যে কেন এই নিষ্ফল প্রয়াস !

আর কিছু না, ওই বুকুর পাটার অভাব।

আচ্ছা, বিকেল বেলাও তো ঠিক সময়ে ঠিকমত চা খেয়েছিলেন অবিনাশ ! হ্যাঁ, খেয়েছিলেন তো। সেই ছুটি মুড়ি। একটু ঘরে কাটানো ছানা নেড়ে তৈরী ছোট্ট একটি সন্দেশ, আর চা। যথারীতিই খেয়েছিলেন।

তারপর সেই নিত্য দিনের আক্ষেপ।

তাতাইটাকে একবার এমুখো হতে দিল না এতদিনের মধ্যে !

চাকুলতাকোনো কোনদিনের মতো আজও বলেছিলেন, তাতাতাইতো তোমাকে আমাকে নোংরা বিচ্ছিন্ন বলে ঘেঁষা দিয়ে চলে গেছে। নিজেই হয়তো আসতে চাইছে না।

অবিনাশ আহত হয়েছেন।

কী যে বল। শিশু পাখির জাত, যা শোনে, তাই বলে। ওসব কি ওর নিজস্ব কথা ? ওর মা বাপই আটকে রেখেছে।

তাই যদি হয় রোজ রোজ আক্ষেপ করে কি লাভ ? এরপর তো খোকাকেও স্বাক্ষর আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিলেন অবিনাশ !

হয়তো বা ভেবেছিলেন, চাকুলতা-মায়া-মমতা-শূন্য হয়ে গেছেন। না হলে এতো অনায়াসে এমন কথাটা বলতে পারলেন !

এই ‘অনায়াস’টা দেখাতে যে কত আয়াস করতে হয়েছে চাকুলতার, তা বোধহয় এখন অবিনাশেরও বাক্যবার ক্ষমতা নেই।

তা' সত্যিকারের কে কাকে 'বোঝে' ?

পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারলে, পৃথিবীতে তো কোনো সমস্যাই থাকত না।

চাক্লতা ভাবেন আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি অন্যকে বুঝতে। তবু বুঝতে পারি না, শুধু শুধু এসে গায়ে পড়ে অপমান করে কেন ?

এটাই কি ক্ষমতার দর্পের প্রকাশ ?

কেন এমন হয় ? ভেবে তো পাই না। আমি তো আমার আমিষটাকে বিসর্জন দিয়েই বসে আছি। জেনে এসেছি, মেয়েরা চিরদিন রান্না ঠাণ্ডার ঘরে বন্দী থেকেছে, অনেক প্রাণ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কখনো বাইরের আলোর মুখ দেখে নি, কোথায় পাবে তারা উদারতা ? কিন্তু আজকের যুগের দিকে তাকিয়ে দেখি কী ভুল ধারণাই পোষণ করে এসেছে লোকে এতোকাল। যার যা প্রকৃতি সে তা করে চলবেই। পরিবেশের অমলা হাওয়া কারো মধ্যে উদারতা এনে দিতে পারে না।

এ যুগের মেয়েরা তাদের পিতামহীর ধারা বর্জন করে চলেছে। আচারে আচরণে সাজে সজ্জায়, সংস্কার মুক্তির দৃঃসাহসে। কিন্তু ভিতরে লালন করে চলেছে, সেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ পিতামহীদের সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা, অপরকে অকারণ আঘাত করার বিলাস। তাই আজো মেয়েরাই মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ।

শাস্ত্রে নাকি আছে বিজ্ঞা বিনয় দান করে। মনে মনে হাসেন চাক্লতা। সব কিছুই তো পান্টে গেছে এ যুগে হাত কাজ করে চলে, মন ভেবে চলে। হঠাৎ সেই ভাবনাটার ওপর ধাক্কা পড়ল। তখন চা খাওয়ার পর।

অবিনাশ বললেন, চলো চাক্ল আমরা দুজনে কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করিগে। চাক্লতা গুর মুখের দিকে তাকান নি, রুটি বেলতে বেলতে চির স্বভাবেই হালকার ভান করে বলেছিলেন, হঠাৎ এমন ধর্মে মতি ?

ঠাট্টা নয় চাক্ল, এইসব হিজিবিজি থেকে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কথাটা বলে ঘরে শুয়ে পড়েছিলেন। খানিক পরে চাক্লতা যখন বলেছিলেন, খেতে দিই ? তখন বলেছিলেন, তুমি খেয়ে নাওগে। বুকটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে।

চাক্লতা গীতাকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছিলেন। তারপর ? তারপর কি আর কিছু কথা বলেছিলেন অবিনাশ ? মনে পড়ছে না। উঃ আঃ করেছেন, জল চেয়েছেন, উঠেছেন, বসেছেন, তারপর আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই আছেন।

এখন চাক্লতার নতুন ভাবনাটুকু হচ্ছে, নাতির অসুখ করল না তো ? ছেলের রাস্তায় কোনো বিপদ হলো কিনা ! মাস্তবের বৃকের মত ভারসহ 'ধাতু' আর কী আছে ? হঠাৎ অবিনাশ উঠে বসতে চেষ্টা করে বলে উঠলেন, 'নাঃ থোকার সঙ্গে আর দেখা হলো না।' শুয়ে পড়লেন।

সেই সময় গীতার গলায় জোর শব্দ শোনা গেল ‘যাই।’ নীচে কড়া নড়েছে। কিন্তু চারুলতার আর্তনাদটা ?

সেটা কখন ? কড়ানাড়ার আগে, না পড়ে ?

আর্তনাদটার ভাষা কী ?

‘খোকা ! খোকারে—’

পরবর্তী আর্তনাদ ‘মা’ ! তাই না ?

কিন্তু এ দৃশ্যের ওপর যবনিকা টেনে দেওয়াই ভালো। কী লাভ এই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন নিত্য অভিনয়ে ঘষা পয়সার মত জৌলুসহীন একটা দৃশ্যকে বসে দেখার ?

সত্তা বিধবার আর্তনাদ, অস্থতপ্ত সন্তানের সাময়িক হাহাকার, প্রতিবেশীজনের মৌলিকত্বহীন সাঙ্ঘনা, মধ্যবিত্ত জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে, এ ‘সীন’ বড় একঘেয়ে ! বড় পুরনো।

অতঃপর কী কী ঘটতে থাকবে, তা সকলেরই জানা। এক একটি মৃত্যু-ঘটনা সেই জানাটাকে ঝালিয়ে দিয়ে যায় মাত্র !

ছেলে নিয়ে গাড়িতে ওঠার সময়, অমিতা একটা স্থির ধাতব স্বরে বলল, এ আমি জানতুম !

তাতাইকে গাড়িতে তোলা যাচ্ছিল না। একটানা চীৎকার করে চলেছে সে, ‘আমি যাব না। আমি যাব না। দাছ কেন মরে গেলো ! দাছ কেন মরে গেল !’ অনেক কষ্টে গাড়িতে তোলা হলো তাকে। সঙ্গে করে নিয়ে চললেন অমিতার বাপী।

অমিতার বড়মাসী এসেছিলেন সেদিন দৈবাৎই। আসেন তো প্রায়। অবস্থা দেখে থেকে গেলেন, একাকিনী ছোট বোনের কাছে।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, ছেলেমানুষ যেতে ভয় পাচ্ছে, এতো ধরে বেঁধে নিয়ে যাবার কী দরকার বাবা !

অমিতার মা বললে উঠলেন, ও বাবা ! না নিয়ে গেলে রক্ষে আছে ? যা মাতৃপিতৃ-ভক্ত সন্তান আমার জামাই। মিতাকে একা যেতে দেখলে আকাশ থেকে পড়বেন। ঘেমা দিয়ে বলবেন, তাতাইকে আনলে না। তুমি কী ?

মাসি বললেন, কী জানি বাবা ! এই বাচ্চা শিশুকে একটা মৃতদেহ দেখাতে নিয়ে যাবার মানে আছে কোনো ? আমাদের আমলে, ছোট ছেলের সামনে ‘মরা’ কথাটা

উচ্চারণই করা হতো না। চুপিচুপি বলাবলি। বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে দেখলে পাড়ার লোকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের। সেখানেই নেয়েছে থেয়েছে থেকেছে শুয়েছে। এখন সবই উদ্ভট।

অমিতার মা বলেন, আমি ভাবছি, আমার মেয়েটার কপাল বটে একখানা। আহা, ওর দুঃখে ভাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। কত কাঠ খড় পুড়িয়ে কত কাণ্ড করে, স্ব্থের ম্খটি দেখতে যাচ্ছে, আর এই ঘটনা। আর পাঁচটা দিন পরে মরতে পারলেন না তিনি, আশ্চর্য !

মাসির দার্শনিক উক্তি, একেই বলে রে—পূর্ব জন্মের শত্রুতা। মরেও শত্রুতা সেরে গেল বুড়ো।

খুব ভুল বলিস নি দিদি ! মেয়েটা তো একদিনের জন্তু স্ব্থ আরাম পায় নি। গের্মো বুড়ো খন্তর, শুচিবাই শান্তুড়ী আর মাতৃভক্ত স্বামী, এই নিয়েই এতোদিন টেনেছে। আহা ! ওই ক্ল্যাটটির স্বপ্ন দেখেছে কি আজ থেকে ? তো যেই না আশার জিনিসটি হাতে এলো, অমনি এই। দুটো মাহুঘ ছিল, নিশ্চিন্দি। এখন কি সমস্তাটি বাড়ল ভাব !

মাসি নিঃশ্বাস ফেললেন, সেই তো ! তোর জামাই কি আর মাকে নিজের কাছে নিয়ে না এসে ছাড়বে ? আহা অমন ছবির মতো ক্ল্যাটটি ! কত মনের মতো করে সাজাচ্ছে, সাজাবে, তার মধ্যে ওই সত্ত্ববিধবা কান্নাকাটি করা শুচিবাই শান্তুড়ী ! মিতুর স্ব্থের বারোটা বেজে গেল !

সেই দুঃখেই মরছি রে দিদি !

একথা বলা চলে না, এ হেন অমানবিক কথা কোনো মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। ‘বৈধবা’ শব্দটা তো তাঁদের কাছে ‘করণ দুঃখময়।’

কিন্তু এমন অমানবিক কথা আপনি উনি তিনি সবাই ঘরোয়া পরিবেশে অনায়াসেই বলে থাকে। সত্যিই তো অমিতার স্বত্ত্বর মএ তার সঙ্গে শত্রুতা করে গেলেন না ? কোথায় দুদিন বাদে অমিতা নতুন শাড়ি গহনা পরে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করবে ; তা নয় আলোচালের হবিস্তি করতে বস !

অমিতার মা বলেন, তোর ভগ্নিপতিটিও তো তেমনি দিদি ! মিতুকে বলছিলুম বলে করে মনোজ্ঞের মাথা কামানোটা যেন আটকায়। গাড়া মাথা নিয়ে ওই নতুন বাড়িতে সভাপাড়ায়—ছি ছি। ভাবা যায় না বাবা। তা’ তিনি বলে উঠলেন, ‘তা বললে চলে ? শাস্ত্রবিধি মেনে যদি বাপের শ্রাদ্ধ করে তো মাথা গাড়া করতেই হবে।...বাপটা মরে গেল তার কাছে গাড়া হওয়াটা এতো বড় হলো ?’ বোঝ ? বুঝি রে। বেটাছেলেরা সব কটাই ভেতরে ভেতরে গোঁড়া রক্ষণশীল। মুখে যতই যা

বলুক, আর নিজেরা যতই সাহেবিয়ানা করুক, মন পড়ে আছে সেই পেছনের অন্ধকারে। এই তোর জামাইবাবু, হঠাৎ হঠাৎ বলে বসবে কী জানিস? ‘আচ্ছা মা যে সেই ষষ্ঠি মনসা কী সব করতেন যেন, তুমি কর না সে সব?... আচ্ছা বাজারে দেখি লোকে লক্ষ্মীর ঘট না কি খুব কেনে, এসব তোমাদের লাগে না?’ বোঝ। গুর বায়না আমি এখন গুর মা ঠাকুরার মত, লক্ষ্মী, ষষ্ঠি মনসা মাকালী নিয়ে জড়ভরত হয়ে বসে থাকি। আবার বাবা মা-রা তো যা করেন সন্তোষী মা। মিতু বলেছিল, বড় মাসির কাছে ভালো করে শিখে নিও তো মা ‘সন্তোষী মা’ করাটার নিয়ম-টিয়ম কী? করলে হয়। মাসি চোখটা একবার বুজে নিয়ে বলেন, আগে থেকে করলেই ভাল হতো। তাহলে এমন সন্তোষের ‘কালে’ এরকম জগা-খিচুরী ব্যাপার হতো না।

এখন আর চিতা জেলে লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে জীবন কী নশ্বর, চিন্তাটা বড় একটা হয় না। সভ্য সমাজে গুটা উঠেই যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ-চুল্লিতে পিতৃদেহটিকে সমর্পণ করে ঘাটের ধারে এসে চুপচাপ ভাবছিল মনোজ, কী অদ্ভুত এই ঘটনাটা ঘটে গেল আমার জীবনে। আর মাত্র দু’মিনিট আগে এসে পড়লেও বাবাকে বলে উঠতে হতো না ‘খোকার সঙ্গে দেখা হলো না।’

অথচ আরো অনেক মিনিট আগেই আসতে পারতাম আমি। বাবার সামনে কী করে সেই প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যাবে সেটাই অমিতার কাছে নিখুঁৎ ভাবে ‘পাঠ’ নিতে নিতে, সময়টা কোথা দিয়ে চলে গিয়েছিল।

‘নিয়তি’ নামক অদৃশ্য এক নিষ্ঠুরা বোধহয় তখন অলক্ষ্যে বসে হাসছিল। আগে এলে আমি হয়তো ভক্তার ভাকতে পারতাম। নিয়তিকেই যদি মানতে হয়, তবে মৃত্যুকে অবশ্য এড়ানো যায় না। কিন্তু আমার মার মনের অপরিণীম আপশোসটা? সেটা তো এড়ানো যেত?

মুখ রাখবার জন্তে আমার মার কাছে মিথ্যে করে বলতে হয়েছে, রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অনেক বন্ধুট গেছে তার জন্তে। জানি না মা বিশ্বাস করেছে কিনা। আজীবন দেখেছি মা সত্যিটা আর মিথ্যেটা খুব বুঝতে পারে। তবু ওই মিথ্যেটা ছাড়া মুখ দেখাবার ত পথ ছিল না আমার, তাছাড়া এও ভেবেছিলাম, যদি এই মিথ্যেটা থেকেও মা একটু সান্ত্বনা পায়। অমিতা আমায় বলেছিল, ক্ল্যাটটা যে অকস্মাৎ কোনো ভাবে জুটে গিয়েছে তার একটা গল্প বলতে হবে। কেউ শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিয়েছিল, অথবা দ্রুতগতির নাম উঠে পড়েছিল, একটা কিছু। তারপর বলে ফেলতে হবে পত্রিকায় নাকি এমাসে আর শুভদিন নেই, তাই চটপট গৃহ-

প্রবেশটা করে নিতে হবে। আর মা বাবাকে একটা দিনের জন্য অন্তত নতুন বাড়ির অনুবিধের মধ্যেই থাকতে হবে। রাত কাটানোই নাকি নিয়ম।

অবোধের যে ভঙ্গীতে বলতে হবে এসব, সেটা অমিতা নিপুণভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল। তবু মনোজ ভয়ানক একটা অস্বস্তির ভারে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি আসছিল।

আচ্ছা, মনোজের কি হঠাৎ মনে হয়েছিল, কোথায় যেন কী একটা হালকা হয়ে গেল!

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও মনে হয়েছিল, কী যেন একটা ভার নেমে গেল। তার মানে মাহুশের সঙ্গে জানোয়ারের বেশী তফাৎ নেই।

পিসতুতো দাদা কমলেশ পিছন থেকে আস্তে ডাকল, মনোজ, আয় চানটা সেরে নে। কমলেশের গলায় স্বরটাই যেন সাস্তনার আর ভালোবাসার। উঠে দাঁড়াল মনোজ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল অনেক চেনা মুখের সারি। এরা সবাই এসেছিল মনোজের দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

মনোজ কখনো এমন সহৃদয়তা করেছে কারো সঙ্গে এমন মনে পড়ল না। যা কিছু দায় দৈব সামাজিকতা, সব ব্যাপারে বাবাই ছিলেন ভরসা। বাবাই যোগাযোগ রাখতেন সকলের সঙ্গে।

হঠাৎ ভারী আশ্চর্যলাগল মনোজের, এরা সবাই ছিল? কিন্তু মনোজ কোথায় ছিল। এরা তার ‘নিকট আত্মীয়।’ ছেলেবেলা থেকে অনেকটা বয়স পর্যন্তই এদের সঙ্গে ছিল খেলাধুলো মেলামেশা। কমলেশদার সঙ্গে তো কত সময় একখানেই থেকেছে। কমবয়েসে তো ছেলেরা মামারবাড়ি এসে থাকে-টাকে। কমলেশও থাকতো।

আচ্ছা কতদিন কমলেশের সঙ্গে দেখা হয়নি মনোজের। নামটাই ভুলে গিয়েছিল যেন।

আমি আমার শৈশব বালা কৈশোর সবাইকে ভুলে গেছি, তারা যেন হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। আমি শুধু আমার যৌবনের মধ্যেই নিমজ্জিত। যেখানে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রথম সূর্যের দীপ্তি আর উত্তাপ নিয়ে বিরাজ করছে অমিতা নামের এক অমিত শক্তিময়ী। যে মেয়ে মনোজের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণটা নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছে এবং পেয়েছে। অথচ একদিন এরা সব আমার খুব পরিচিত, খুব বন্ধু ছিল। এখন শুধু একটা ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি। তাও দ্বৈতলাম বলে।

মনোজ দেখল, এরা সকলেই স্নানের জন্তে প্রস্তুত। মনোজের মনে পড়ল বেরোবার আগে এক ফাঁকে অমিতা বলেছিল, ‘গঙ্গায়-কল্লায় ডুব দিতে যেও না যেন।’

মনোজ বোকার মত বলল, কোথায় চান করা হবে ?

কমলেশ হেসে উঠল।

আশ্চর্য, কমলেশ অনায়াসেই হেসে উঠতে পারল এই পরিস্থিতিতে। হেসে বলল, এই যে সম্মুখে প্রবাহিত পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ! বাড়ি গিয়ে, আর একবার চান না করলে যার মাহাত্ম্যটি গা থেকে টেঁচে তোলা যাবে না।

চান করে অনেকেই যে যার আস্তানায় চলে গেল। শুধু কমলেশ রইল সঙ্গে। হঠাৎ বলে উঠল, মামা যে এ ভাবে হঠাৎ চলে যাবে ভাবতেই পারি নি। এই গত সপ্তাহেই দেখেছি, কিছু টের পাওয়া যায় নি।

মনোজ ভাবল, গত সপ্তাহে ? কোথায় দেখেছিল কমলেশ মামাকে ? মামার বাড়িতে না কি ?

এরা তাহলে এখনো আসে ? মনোজ জানতে পারে না। ইদানীং অনেক দিন আর মা বাবার সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আচ্ছা, মাও তো কই আর ডেকে বলত না, জানিস থোকা, আজ অমুক এসেছিল। জানিস থোকা আজ এই হয়েছিল।

কিন্তু কখন বলবে ? কখন মা তার থোকাকে পেত ?

বাবা মায়ের কাছে বসে একটু কথা কইলেই যেন ওই ‘থোকা’ নামের লোকটার কী যে একটা অস্বস্তি হতে থাকে। অজানিও একটা অপরাধ বোধ, অকারণ একটা পিছু-টান, কোথায় যেন কী একটা কল্লুর হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের অস্বস্তি। শুধু মা বাবাই বা কেন ? অমিতার অল্পপস্থিতিতে যে কারো সঙ্গে কথা বললেও। কেন এমন হয় মনোজ জানে না।

অমিতার সেই বন্ধিম ওষ্ঠের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের ঝিলিক মারা হাসিটুকুই কি এই অস্বস্তির জনক ?

‘সহজ’ হবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে কমলেশের। অনেক খানিকটা প্রাণশক্তি না থাকলে বোধ করি এমন ‘সহজ’ হওয়া যায় না।

চ্যাব্বিতে চেপেই বলে উঠল, গাড়িটা ঘুরিয়ে একবার বাড়িতে বলে যাই।

কাছেই বাড়ি কালীঘাটেই।

গাড়ি থেকে নামতে হলো না কমলেশকে, দরজার কাছে পৌঁছেই দেখল কমলেশের বৌ ছেলেকে নিয়ে তার স্থল থেকে ফিরছে। এখন, ছেলের বইয়ের বোকা তার

মার কাঁধে বুলছে ।

কমলেশ বলল, ছাথ একবার মাতৃস্নেহের ঘটা । ছেলেকে যে খেটে পিটে ‘করে খেতে’ হবে তা খেয়াল করছে না ।

বলেই বলল, তোকে আর বলছি কি । তোকেও তো মামা এই ভাবে পুতুপুতু করে মানুষ করেছিল ।

বৌ দাঁড়িয়ে পড়ল ।

কমলেশ গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে বলল, খবরটা দিয়ে যেতে এলাম, এখন মামার ওখানেই চলে যাচ্ছি—না না ভয় খেওনা, মামার ‘বর্তমান বাসায় নয়, পরিত্যক্ত বাসায় । মামার জন্তে ভাগ্নেরও একটু অশৌচ লাগে, ওখানেই থেকে যাব । দুদিন পর ফিরব । তোমার হাতে পড়লে তো, খাওয়া জুটবে না । ‘ভাতে ভাত’ মানে হয়তো আধখানা কাঁচকলা ভাতে, আর ফল মানে, একফালি শুকনো শশা আর একটা বুড়ো আঙুল সাইজের কলা ব্যস । কী গো এর বেশী আশা আছে ?

মনোজ না বলে পারে না, আঃ কমলেশদা, কী হচ্ছে ?

কমলেশের বৌ অগ্নান গলায় বলল, তোমরাই ছাথো ভাই, সারাদিন কী হয় ।

তোমাদের এই দাদাটিকে দেখলে মনে হয় বৌ খেতে দেয় না ।

কমলেশ তার পুষ্ঠ বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহটির দিকে ‘অপাঙ্গে একটি দৃষ্টিপাত করে বলে এ হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি । আচ্ছা, ওই কথাই থাকল । সাবধানে থেকো । এই রাতুল, মাকে নজরে রাখবি । যেন এই কাঁকে পৃথিবীর যত কাজ টেনে টেনে বার করে ঘাঁটে না । পূর্বজন্মে তো ঝাড়ুদারনী ছিল, স্বযোগ পেলেই ঝাড়ু ধরবে ।

আচ্ছা টা টা । মুখটা ঢুকিয়ে নিল গাড়ির মধ্যে !

মনোজ একটু পরে বলল, তুমি এইভাবে কথা বল, বৌদি রাগ করে না ?

করলে ভাতের চাল চারটি বেশী নেবে । সবইতো নিজের হাতে । আমরা হতভাগা তো ওনাদের হাত তোলাতে পড়ে থাকি ।

হেসে উঠল জোরে ।

একজন সত্ত্ব পিতৃহারার সামনে, (মৃত ব্যক্তি তার নিজেরও নিকটাত্মীয় ছিল) এভাবে হাসাটা যে অহুচিত এ কথা মনেও আসে না । অথচ আশ্চর্য, হৃদয়হীন বলেও তো মনে হচ্ছে না কমলেশকে ।

তুই একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল না সন্ট-লেকে ?

নাঃ, এতো চেষ্টা, এতো লুকোছাপা, তবু অবাক হয়ে দেখছে মনোজ কারুরই ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই ।

মনোজ স্তব্ধ গলায় বলল, পেয়ে গেছি একটা ।

লাকীম্যান ।

বলল কমলেশ, একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাওয়া তো ভগবান পাওয়াতুল্য । লাথ দুলাথ গুণে দিয়েও যেন ভিক্ষে পেয়ে বর্তে গেলাম । শুনে অবধি তো তোর বৌদি আমায় খেয়ে ফেলছে ।

মনোজ ক্ষীণ স্বরে বলল, তোমায় কে বলল ?

খবর বাতাসে ভাসে । তোর ফ্ল্যাটের পাশেই যে এনার মাসতুতো বোনের ফ্ল্যাট ! মজুমদার । দেখিস গায়ে পড়ে ভাব করতে আসবে । দুবেলা আসবে । জীবন মহানিশা করে ছাড়বে । তো সংবাদদাত্রী সেই মাসতুতো বোন, শুনে অবধি আমায় উঠতে বসতে গল্পনা । বলে, মনোজ তোমার ছোট, মা বাপ থাকতে এমন একখানা হিম্মত দেখাতে পারল, আর তুমি নাকে তেল দিয়ে বসে আছো । তোমার তো কেউ কিছু খোঁটা দেবার নেই । হিংসেয় জ্বলছে, বুকলি ? মেয়ে মাহুঘের স্বভাব-ধর্মই ওই । ওরটি কেন ভালো হলো আমার কেন হলো না । আমি তো বলি হা হা হা, বলি যে অত্ত মেয়ের ভালো বর দেখল কত বুকই ফাটে তোমাদের । তো বায়না তো করা যায় না, আমার ওই রকম বর চাই ! দে, শালা অন্তত জোগাড় করে । ওর মতন বাড়ি গাড়ি ।

আঃ । কমলেশদা, এই সব বল তুমি ?

—বলব না কেন ? সত্যি কথা বলবার সংসাহস থাকবে না পুরুষ বাচ্চার ? ওরে ওদের গল্পনাকে কেয়ার করতে শুরু করলে রক্ষে আছে ! সে তো সমুদ্রে কুল পাবার চেষ্টা ! আমার ওই কালীঘাটের বাড়িটায় এখনো ৬০ টাকায় ভাড়া আছি ভাবতে পারিস ? অবিশি বাবার আমল থেকেই থাকা । আগে পয়তাল্লিশ ছিল, বেড়ে-ফেড়ে ষাট দাঁড়িয়েছে । দোতাল বাড়ি, ওপর নীচে চারখানা ঘর, দালান রান্নাঘর, বাথরুম । রান্নাঘরের সাইজই তো এ যুগের লাখ টাকার ফ্ল্যাটের বেডরুমের থেকেও বড় । বাড়িওলা ব্যাটা তো বোধহয় দুবেলা শাপমুক্তি দিচ্ছে । আমি উঠে গেলে ওই বাড়িই সাত আট শো টাকায় তুলবে । বাদে মোটা সেলামী ! তাহলেই বোঝ ? ...তা' তোদের ওই বাড়িটার জন্তে তো বাড়িওলা বুড়ো নির্ঘাৎ ৩৭ পেতে বসছে । যেই ছাড়বি সেই লুফে নেবে । ও বাড়ি তো এখনো হাজার বারোশোর কম নয় ।

আমাদের বাড়িটা !...আড়ষ্ট হয়ে তাকায় মনোজ ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে গাড়ি । কমলেশের দ্রুতভাষীত্ব এখন আরো দ্রুত ।

হ্যাঁ তোদের ওই বাড়িটা তো ছাড়তেই হবে ! মামীকে একা রেখে তো আর ড্যাংভেঙিয়ে চলে যেতে পারবি না তুই । মামা যে এত শিগগির চলে যাবে, কে

ভেবেছিল। একটা মন্ত প্রবলেম হয়ে গেল তোর। এখানে পুরানো আস্তানায় দুই বুড়োবুড়ি থাকতো, নতুন পাখীরা নতুন ডালে গিয়ে বসতো। ছ'পক্ষই স্বখে স্বাধীনে থাকতো। তো কুচকুরে ভগবান ব্যাটা তো কারুর স্বস্তি সহিতে পারে না।

গাড়িটা মনোজদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

কমলেশ বলল, জলভর্তি ঘট্টা তোর হাতে আছে তো? অবু মামাকে পুড়িয়ে এলাম অ্যা? মামীর সামনে যে কী করে—

খুব প্র্যাকটিক্যাল কমলেশ ঘাড়টা ঘুরিয়ে মুখ আড়াল করে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

শিশুর মনোজগৎটা বিচিত্র বৈকি। মনে ভাবা গিয়েছিল সেই ধরে বেঁধে আনা তাতাই হয়তো এ বাড়ি এসে দাতুর মৃতদেহ দেখে গড়াগড়ি খেয়ে চোঁচাবে। সে রকম কিছুই করল না সে। নেহাৎ বাচ্চাদের মতো মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, নিম্পলকে দেখতে লাগলো মৃতের সাজসজ্জা।

একবার শুধু বলে উঠল, ফুলের মালা পরেছে। বর না কি? কারুর কানে গেল কারুর গেল না। যার কানে গেল, সে চোখ মুছল। লোকের তো অভাব থাকে না এ সময়। লোকে লোকারণ্য।

খাট তোলার আগে কোনো এক পাকা মহিলা বলে উঠলে, দাতুকে প্রণাম করো তাতাই।

তাতাই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, ‘মরে গেছে আবার প্রণাম।’ বলে বৌ করে ছুটে পালিয়ে গেল।

কে একজন বলল, বোমা ছাখো ছাখো। কোথায় আবার ছুট মারল। আত্মীয়জনের অনেকেরই প্রত্যাশা, ওই শিশুটা একটা বাড়াবাড়ি কিছু করুক। কান্নাকাটি, খেতে না চাওয়া, অথবা দাতুর ঘরেই পড়ে থাকা! যাহোক কিছু লক্ষ্যণীয় কিছু। যেন তাতেই সত্ত পরলোকগত আত্মা পরম শান্তি পাবে!

কিন্তু শিশুর মতো নির্মম আর কে আছে? শিশুর মত বেইমান?

বললেন, এসব কথা বিজ্ঞরা। আড়ালে আড়ালে।

তা বলবেই না বা কেন? ‘শিশু’ বলে কি সংসারী বুনোদের কাছে রেয়াৎ পাবে? শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা মতিগতির নিয়ামক কে? আমড়া গাছে তো আর ছাংড়া ফলবে না?

এই যে নাতির জন্তে ‘দাতুতাই’ বলে প্রাণটা বার করতো মাহুঘটা, একবার তার নাম মুখে আনছে না? তাও না পারুক, সেই ঘরটার একবারও ছায়া মাড়াচ্ছে না গো!

শুধু কি তাই ? ‘দিদার কাছে একটু বসবে চলো’ বলে ডাকলে তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে । ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দিদার কোলের কাছে নিয়ে বসালে ছিটকে পালিয়ে আসবে ‘দিদাকে বিচ্ছিন্নী লাগছে’ বলে ! তো এই অমানবিক মনোভাবের উৎসযূল কী ?

শুধু যে অমিতারই মা তা তো নয় ? মনোজেরও আছে । একজন নয় জনাতিন ।

এই অনিয়মের বাড়িতে তাতাইটার যে কী দুরবস্থা হচ্ছে !

অমিতা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি একটা শক্ত রোগে পড়ে যাবে ছেলেরা ।

মনোজ হতাশভাবে তাকাল । এ ক্ষেত্রে কী জবাব দেওয়া যায় ভেবে পেল না ।

অমিতা ক্ষুব্ধ গলায় বলল, এইটুকু বাচ্চা, ওকেও শাস্ত্রীয় আচার মেনে নিরামিষ খেতে হচ্ছে । মাথায় তেল দিতে পারছে না । রেখা ছন্দা শাস্ত্রী সেদিন টেলিফোনে শুনে আকাশ থেকে পড়ল । বলল, ‘ভাবা যায় না ।’

কমলেশের সংগে মিশে মিশে মনোজেরও কি কোথাও একটু হুঃসাঃস শঙ্কিত হয়ে গেছে ? তাই বলে ফেলে, কত সম্প্রদায়ের মধ্যে তো নিরামিষ খাওয়ারই চল । তাদের বাচ্চারা কী—

চমৎকার ! একটা বোকাটে প্রেজুডিসের ভয়ে তো বেশ বুদ্ধিমানের মতো যুক্তি খাড়া করতে শিখে ফেলেছ ? ‘হ্যাবিট’ বলে একটা কথা আছে জানো সেটা ? জানো হয়তো, কিন্তু মানো না । আমি তো ভেবেছিলাম ওকে ও বাড়িতে মার কাছে পাঠিয়ে দেব । বাপী তো প্রায় রোজই আসছে । তো ওই বিচ্ছু ছেলে, কিছুতে গেল ? একেবারে একটা ইম্পাত ! অতিরিক্ত আদর আর প্রশ্রয়েই এমনটি হয়ে বসেছে, সাথে আমি ‘ফ্লাট ফ্লাট’ করিনি । চোখ চেয়ে দেখছি, ছেলেরা বিগড়ে যাচ্ছে অথচ করার কিছু নেই । এ যে কী অবস্থা । ভেবেছি হোক আমার নিন্দে, ছেলের ভবিষ্যৎ আগে ।

একবার থেমে ঠোঁট কামড়ে বলে, অবশ্য নিন্দের যে কী আছে, সেটাও অবোধ্য ! সভ্য জগতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গুহায়ুখো হয়ে দাঁড়ালে অবশ্য আলাদা কথা । তোমাদের আত্মীয়গুণ্ঠির পায়ে নমস্কার ! একটা মৃত্যু উপলক্ষে বাড়িতে যেন বিয়ে বাড়ির সমারোহ । তোমার ওই মাসি পিসি খুড়ি জোঠিরা এখানে এসে বসে থেকে ভাবছেন যেন কতই উপকার করছেন ।

মনোজ ভয়ে ভয়ে বলল, তো আমরাও তো সত্যি কিছু জানিও না ।

জানবার এতো কী আছে তাও জানি না। এসব ব্যাপারে সবই তো পুরুত-টুকুত বলে দেয়। তা তোমাদের ওই মেজ জ্যোটি না কে? তিনি আবার তখন কাকে যেন বলছেন শুনলুম ‘লোক’ই ‘শোকের’ ওষুধ! কথার বাঁধুনী ভাবো? ইচ্ছে হলো চৈচিয়ে বলি, ‘লোকই রোগের সৃষ্টিকর্তা।’ উঃ রাতদিন এই লোকারণার মধ্যে থেকে সারাক্ষণ মাথা ঝিমঝিম করছে। আশ্চর্য! এতো আত্মীয় তোমাদের। হরদম আসছেই আসছেই শোকে সান্ধনা দিতে। যাই বলা—এ হিসেবে তোমার মা বাবা নমস্ত্র ব্যক্তি। জীবনের প্রারম্ভ থেকে, এ যাবৎকাল পর্যন্ত যত আত্মীয়-জনেরা, শাখায় প্রশাখায় তো বেড়েই চলেছে, সবাইকে বুকে ধরে বসে আছেন। সবাই নিতান্ত ‘আপন জন।’ ভাবা যায় না।

অমিতা চলে যায় ‘ভাবা যায় না’ বলে। কিন্তু মনোজ ভাবতে থাকে। ভেবে অবাক হতে থাকে। সত্যি, এতো আপনজনকে বুকে ধরে রাখবার এই অসীম ক্ষমতা কোথায় পেয়েছিলেন এই অতি সাধারণ মানুষ ছুটি? তুতো থেকে তুতোর তুতোয় পৌঁছেছে তাঁদের আপনজনের পরিধি। জ্যোঠামশাইয়ের শালাও না কি মনোজের মামা।’

আচ্ছা এই বিশাল পরিধিটাকে যোগসূত্রে বেঁধে রেখে এসেছেন কোন্ মন্ত্রবলে? তা’ মন্ত্রবলই বলতে হবে বৈকি। অর্থবল তো ছিল না এমন কিছু! ছিল না বিশেষ কোনো ক্ষমতার বলও। যাতে লোককে কাছে টেনে রাখা যেতে পারে।

শুধু ভালবাসা? শুধু আন্তরিকতা?

অন্তরটা কতো বড় হলে এতোটা আন্তরিকতার সঞ্চয় জায়গা পায়?

কতজন যে আসছে মনোজকে তার পিতৃবিয়োগে সান্ধনা দিতে। কে তারা সবাইকে বুকেতেই পারে না মনোজ। আর ভাবে মা বাবা এতো জনকে জেনে চিনে মজুত রেখে এসেছেন!

তবু এরা যতক্ষণ আছে, মনোজ একটা তাড়া করে আসা আতঙ্কের হাত থেকে বেঁচে রয়েছে। এরা সরে গেলেই সেই আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সেই আতঙ্ক ‘চাঞ্চল্য’।

পিতৃদায়জানাতে সব বাড়ি যেতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে অমিতার মা বললেন, অবশ্যই। এখানে আর পারের কাণ্ডারী কমলেশকে আসতে হয় নি, যে নাকি সর্বত্র নয়ে নিয়ে যাবে মনোজকে। মনোজ আর ক’ জনের বাড়ি চেনে?

এখানে সঙ্গী মনোজের সংসার তরণীর চিরকাণ্ডারী।

শাস্ত্রী বললেন, একদম খালি পা? তোমাদের বাড়িতে বাবা সবচেয়েই বাড়াবাড়ি।

রবারের চটি তো আজকাল সবাই পরে ! তা' যাক, দিন তো কেটেই এল ।

শুনলাম প্রায় রাজস্বয় যজ্ঞ ফেঁদেছ ?

শ্বশুর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কী করবে ? ওদের যে অনেক আত্মীয় । এতো আছে জানতাম না ।

মহিলা একটু হাসলেন, আত্মীয়জনের সংখ্যার লিমিট না থাকতে পারে, ক্ষমতার তো একটা লিমিট আছে ?

আহা সে ওরা বুঝবে । জনবল যথেষ্ট । ওই ওর পিসতুতো দাদা কমলেশ না কে, একটা ছেলে দশটা মানুষের খাটুনি খাটছে ।

ঘরে ঘরভেদী থাকলে আর কী করা ? এই মানুষটির উপস্থিতি বড় অস্ববিধে-জনক অমিতার মার ।

তবু কাজের কথা তো পাড়তেই হবে ।

তোমার মায়ের কী ব্যবস্থা করছ ?

আবার সেই অস্ববিধে । কর্তার উক্তি, আহা ব্যবস্থা আবার কী ? মা তো ওদের সঙ্গেই থাকবেন ।

অমিতার মা এতে অবিচলিত থাকতে পারেন না । বলে ওঠেন, তুমি তো বলে দিলে একটা কথা । বেয়ানের আমাদের কত রকম বিদঘুটে 'হাবিট' আছে জানো তুমি ?

কী আশ্চর্য । উনি কি তাহলে একা থাকবেন ?

তা কেন ?

'থাকে ফাঁড়া থণ্ডে যাক—' গৃহিনী বলে ওঠেন আজকাল অনেক জায়গায় যথেষ্ট রেসপেকটবল্ 'হোম' হয়েছে । এই রকম সব একা হয়ে যাওয়া মানুষদের জন্তে । টি. ভি. তে দেখিয়েছে, অতি স্বন্দর বাড়ি । ব্যবস্থাও—

অমিতার বাপী হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, হয়েছে না কি ? যাক জেনে নিলাম, এখন যমরাজ এসে দাঁড়ালে ভয় পাব না । নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব, 'চলুন আর ।' মিতু মা তুমিও তাহলে ক্লীয়ার ? বাপ ব্যাটা মরলে, 'মার কী হবে', ভাবতে হবে না । হা হা !

'আয় একটু চা খেয়ে যা'...বলে মেয়েকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সর্বপ্রকার কুসংস্কারবজ্জিত মহিলাটি বিবর্ণমুখে গলা খাদে নামিয়ে বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস ? বলিনি তোকে আমি ? ঠাকুর-ঠাকুর মাহুলী কবচ তুকতাক, অনেক কিছু জানে তোর শাশুভী ; করেছে কিছু । এই মানুষের আগে ওদিকে এতো চল ছিলো ? জানি না তোর কপালে কী আছে । এখন নাতিটিকে হাতে পেয়ে কী

করছেন কে জানে ? হয়তো তাকে ফুসলোচ্ছেন ।

কিন্তু মহিলার আশঙ্কা তো নেহাৎই অমূলক । নাতি তো তারস্বরে ঘোষণা করছে, না দিদা, নতুন বাড়িতে যাবে না । দিদা এইখানেই থাকবে ।

কেন ?

আমার ইচ্ছে ।

হায় । এই কি তুকতাকের ফলশ্রুতি ?

দোহাই তাতাই, বাড়ি গিয়ে যেন দিদার কাছে বোলো না একথা ।

বাপের মিনতি বাণীতে একটু কর্ণপাত করেই অমোঘ উত্তর দেয় তাতাই, আমার ইচ্ছে হলে বলব, না ইচ্ছে হলে বলব না ।

যথাদিনে, ‘রাজসূয় যজ্ঞ’ সমাপ্ত হয় । বানের জলের মতো ফুলে ফেঁপে যে শ্রোত এসে পড়েছিল, তা বানের জলের মতোই সরে গেল ।

অতঃপর সেই পুরনো সদস্য কটি ? ইস্ । তাই কি ?

বিশাল একটা ফাঁক নেই তার মধ্যে ? যেটা একটা গহ্বরের মত হাঁ করে ভয় দেখাচ্ছে । চারুলতা নামের একদম বদলে যাওয়া চেহারার মানুষটা কি তখন ওই গহ্বরটার পরিমাপ করবার সময় পেয়েছেন ? পান নি তাই এখন একটা স্তব্ধতার জগতে ঢুকে পড়ে, সেটা মেপে চলেছেন ।

ভেবে চলেছেন এতদিনের একান্ত আশ্রয়স্থল, এই সংসারটা হঠাৎ এমন অর্থহীন হয়ে গেল কী করে ?

সংসারের চিরপরিচিত উপকরণগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে যান চারুলতা । এই অর্থহীন বস্তুপুঞ্জকে জীবন ভোর তিনি পরম মূল্যবান ভেবে এসেছেন ?

এই হাড়ি কড়া ঝাঁক কাটারি শিল নোড়া চাকি বেলুন ! এই একে একে কিনে জমিয়ে তোলা স্টেনলেসস্টিলের বাসনের গাদা, ভাঁড়ারের তাকের পুরনো শিশি কোটো বাতিল করে করে, ছোট বড় মেজ সেজ নানা মাপের পলিথিনের কোটোয় সাজিয়ে রাখা জিরে পাঁচফোড়ন হলুদ কালোজিরে । এগুলো চারুলতার একান্ত ভালবাসার বস্তু ছিল । কোথায় চলে গেল সেই ভালবাসা, সেই মূল্যবোধ ? এখন গীতার মা ওগুলো চেয়ে বসলে, অনায়াসেই বলতে পারেন, নিয়ে যা ! আমি আর এসব নিয়ে কী করব ?

আচ্ছা এতো অবকাশই বা কী করে এল এখন চারুলতার জীবনে ? কোথায় সঞ্চিত ছিল এই অবকাশের দুর্বহ বোঝা ? সেই কোন্ কালে এ সংসারে এসেছিলেন

চাকলতা। তদবধিই তো ঘাড়ে মাথায় কাঁধে পিঠে, শুধুই কাজের বোঝা। কিন্তু সে বোঝা কি এতো দুর্বল ছিল ?

কাজ মানেই তো আহ্লাদের, আনন্দের, ভালবাসার।

সংসারে কত পট পরিবর্তন হলো, কত জন বিদায় নিল এ সংসার থেকে। শ্বশুর, শাশুড়ী, বিধবা ননদ। অতঃপর কেবলমাত্র একটি সন্তান নিয়ে ছুটি মাসুকের যেন গাঁটছড়া বাঁধা জীবন।

এই খানটায় চোখ ফেলে যেন থমকে থেমে যান চাকলতা ! কী ঔজ্জ্বল্য কতআলো। জীবনের এই অধ্যায়টুকু বুঝি সোনার জলে লেখা। খোঁকা বড় হয়ে উঠছে, লেখাপড়ায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর। চটপট কৃতী হয়ে ওঠা। দিন যেন পালকের মতো হালকা। গানের স্বরের মতো আবেশময়।

কিন্তু সে দিনগুলো হঠাৎই কোথা দিয়ে যেন চলে গেল। বড় তাড়াতাড়ি। সংসারে হল আর এক নতুন পট পরিবর্তন।

মেয়ের বিয়ে দিতে ‘কন্যাদান’ ‘কন্যা সম্প্রদান’ শব্দগুলি প্রচলিত, কিন্তু ছেলের বিয়ে দিতে ? না, এমন কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই।...এটার ভূমিকা নিঃশব্দের, তবে একই টাকার এপিঠ ওপিঠ।

অথচ সমাজের টেবিলে শুধু একটা পিঠই চিংকরা পড়ে থাকে। কন্যাদান। ‘কন্যা সম্প্রদান।’

না, সমাজে পুত্রের সম্পর্কে এরকম কোনো শব্দ চালু নেই।

কিন্তু কেন নেই ?

থাকা উচিত ছিল। থাকা দরকার ছিল। তাহলেই তো পুত্রের জন্মমূহূর্তটি থেকেই মনের মধ্যে চলতো প্রস্তুতির কাজ। এটি আমার নিজের জন্তে নয়, অন্য কেউ একজনের জন্তে। যেমন কন্যাসন্তানের বেলা।

এদের তৈরী করে তোলা আমার কাজ। তৈরী করা, কৃতী করা ! যাকে যত কৃতী করে তুলতে পারবে তার ‘মালিক’ পায়ের তলায় ততো শক্তমাটি পাবে। ততো শক্তি সঞ্চিত হবে তার।

কিন্তু আমাদের সমাজ একটা কাল্পনিক স্বর্গ গড়ে রেখে, একটি মূঢ় আশায় কন্যা আর পুত্রের মধ্যে ব্যবস্থা রেখেছে।

পুত্র সন্তান ‘আমার জন্তে’ আমার বংশধারা রক্ষার জন্তে, আমার পরলোকবাসী (যদি থাকে সেই পরলোক) পিতৃপুরুষের জন্তে !

কী মূঢ় প্রত্যাশা !

এই মূঢ় প্রত্যাশার জগুই না, অহরহ অন্তরের অন্তরালে চলছে নিঃশব্দ ব্যবচ্ছেদ।

অদৃশ্য রক্তক্ষরণ !

চারুলতা বিদূষী নয়, চারুলতার চিন্তা ভাবনার জগতে কিছু আর প্রগতিশীল চিন্তার প্রশ্ন থাকার কথা নয়। নেহাৎই সাদামাঠা সেই জগৎ, তবু চারুলতা মাঝে মাঝে ভাবেন, সমাজব্যবস্থা যদি পুত্রের সম্পর্কে ওই রকম একটা কিছু থাকতো, বোধ হয় ভালো হতো, প্রস্তুতি থাকতো মনের মধ্যে।

তাহলে আর এমন ভিতরে ভিতরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটত না। চলত না লড়ালড়ি আর কাড়াকাড়ির নির্লজ্জ প্রকাশ !

অথবা হ্যাংলামি আর কাঙালিপনা !

অবিনাশ অবশ্য চারুলতার মতো এমন প্রগতিশীল চিন্তার ধার ধারতেন না, চারুলতা এ ধরনের কথা বললে রেগে যেতেন। বলতেন, চমৎকার। তুমিও যে দেখছি চিন্তা ভাবনায় বেশ আধুনিক। হয়ে উঠেছে। বাংলা গল্প উপগ্রাস পড়ে পড়ে বুঝি ? ছেলের কাছে প্রত্যাশা থাকবে না ? তবে কার কাছে প্রত্যাশা থাকবে শুনি ? সারাজীবন তো ভুতো খাটুনী খেটে মরা, জীবনের শেষের দিকে ছেলে বোঁ নান্দি-নাতনী নিয়ে সংসার করাটাই তো, জীবনের সার্থকতা। এই দিনটির আশাতেই তো দিন গোণা। হঠাৎ ভাবতে বসবো, এ আশা ভুল। এ ইচ্ছে হ্যাংলামি ! কেন ? আবহমান কাল ধরে কী চলে আসছে ?

চলে আসছে বলেই কি চিরকাল চলবে গো ?

চারুলতা হেসে ওড়াতে চাইতেন। কিন্তু অবিনাশ উষ্ণ হতেন। বলতেন, কেন, সেই চলে আসার মধ্যে কী এতো দুঃখটা ছিল শুনি ? আমাদেরও কি একটা বয়েস-কাল ছিল না ? গুরুজনকে মাগ্ন ভক্তি, বাধ্যতা, নম্রতা, কর্তব্য দায়িত্ব, সভ্যতা ভব্যতা, সবকিছু মেনে মেনেই তো চলে এসেছি। আমরা খুব দুঃখী ছিলাম ? কত স্নেহ, কত আনন্দ, কত শান্তিতে কাটিয়েছি, ভাবো তো সেই সব দিনের কথা ?

চারুলতা বলতেন, আমাদের আমলের কথা বাদ দাও !

অবিনাশ আরো রেগে উঠতেন।

চিরকালের সদা সন্তোষ সাদা প্রসন্ন শান্ত স্বভাবের মানুষটা, রাগ কাকে বলে জানতেন না। অথচ ইদানীং প্রায় প্রায়ই রেগে উঠতেন। রেগে বলতেন, কেন, বাদ দেব কেন ? ওই বাদ দিয়ে দিয়েই তো ক্রমশঃ সব বাদ চলে যাচ্ছে ! সভ্যতা ভব্যতা, নম্রতা চম্ফুলজ্জা, রীতিনীতি আচার নিয়ম, সব বাদ ! গুরুজনকে মাগ্ন করা মানে নিজের অপমান। ছি ছি। ঝাড়ু মারো তোমাদের এ যুগের মুখে। কিছু না থাকুক, একটু ভালবাসা থাকতে নেই ? একটু উদারতা থাকতে নেই ?...কিন্তু এই তোমাদের

এযুগই কি এতে খুব সুখে শান্তিতে আছে ? তা হলেও তো বুঝতাম । সর্বদাই তো ব্যাজার বিরক্ত, আর অসন্তোষ, অপ্রসন্নতা !

তা' চারুলতাও এই প্রশ্নের ধাঁধায় থাকেন । সত্যি, 'আহ্লাদ' জিনিসটা এরা কোথায় হারিয়ে ফেলেছে ? হয়, সাময়িক "হি হি" আছে, নয়, বিরক্তি, বেজার !

আচ্ছা আমাদের কী এতো ছিল ? সবসময় অকারণ একটা আহ্লাদের মধ্যে থাকতাম কী জন্তে ?

ভাবেন এসব চারুলতা অনেক । কিন্তু অবিনাশ যখন এ আক্ষেপ করেন, তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ছাড়তেন ।

কিন্তু কেন ? কেন চারুলতা কেবলই তাঁকে থামাতে চেষ্টা করতেন ?

কেন চারুলতা অবিনাশকে বুঝতে দেন নি আমিও তোমার মতোই এই মনোবাধ্য ভুগি গো । আমিও তোমার মতোই ভাবি ; ভালবাসার মতো বড় জিনিস না হোক সামান্য একটু সৌজন্য, সামান্য একটু উদারতা, এটুকু কি দেওয়া যায় না ? মাগ্ন করবে এমন প্রত্যাশা করি না অকারণ, অহেতুক তেড়ে এসে অপমান করারই কি খুব দরকার তোমাদের এ যুগের ?

তবে সবচেয়ে কষ্ট হতো চারুলতার খোকার ছুববুজ ! ওর ভেতরের দুঃখও কি বুঝতেন না ? ওর নিরুপায়তা, আর হতাশ আত্মসমর্পণ, বুঝতে পারতেন না কি চারুলতা ? কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পেতেন চারুলতা । মনে করতেন আঙনের ফুলকিকে বাতাস না দিয়ে, জল দেওয়াই বুদ্ধির কাজ ।

নিজেকে সেই মানুষটার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করতেন চারুলতা । অথচ আজ ? আজ সেই মানুষটার অভাবে, চারুলতা যেন আপন অস্তিত্বটাকেই খুঁজে পাচ্ছেন না ।

এই তিনিই কি সেই চারুলতা ?

বিশ্বাসে আসে না, অহুভূতিতে আসে না । মনে হয় সে আর কেউ ।

এখন একবারের জন্তে যদি সেই কিছুটা বোধহীন, ভিতরের অহুভূতি প্রকাশ করে ফেলা, নেহাৎ সাধারণ মানুষটাকে দেখতে পেতেন চারুলতা ! এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিতেন ।

কিন্তু একেবারেই কি বোধের জগৎ অহুভূতির গভীরতা ছিল না অবিনাশ নামের অতি সাধারণ মানুষটার ? তাহলে কী করে সেদিন, ইঁা বোধহয় দ্বারা যাবার কটা দিন আগে, হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা চাক, ধরো তুমি খুব যত্ন করে একটি

গোলাপ গাছে হৃন্দর একটি গোলাপ ফুটিয়েছ, সেই ফুলটার ওপর তোমার প্রাণঢালা, তো সেই ফুলটি গাছ থেকে তুলে তুমি একজনকে উপহার দিলে। অ্যা স্তনতে পাচ্ছে? উপহার দিলে, আর তক্ষুণি দেখলে, ফুলটাকে নিয়ে সে ছিঁড়ে কুঁচি করল, তারপর মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে থাকল, অথচ তোমার কিছু বলার জো নেই, কেমন লাগে তোমার?

চারুলতা কি বুঝতে পারেননি, কিসের এই তুলনা! ‘খোকা’ বলে যে সমস্তটি প্রাণ-ঢালা ছিল তাঁর। কিন্তু চারুলতা কেন এই উক্তিতে একাঅ হয়ে বলে উঠতে পারেননি, ওগো তুমিও এই রকম ভাবে ভাবো?

চারুলতা না বোঝার ভান করে বলেছিলেন, হঠাৎ এমন কবিত্তে কথা! কবিতা টবিতা লিখছ না কি আজকাল?

অবিনাশ আর কথা বলেননি। পড়া খবরের কাগজটাই আবার মুখের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

সেই মুহূর্তগুলো আর কোনো মতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না। শুধু মৃঢ় কল্পনায় ভাবতে হবে বসে বসে, কোনো একদিন ‘সেখানে’ দেখা হবে।

নিস্তরঙ্গ নদীতে একটা ঢিল পড়ল।

দিদা, আমার একটা থলি চাই।

তাতাই এসে দাঁড়িয়েছে। যেন বায়ুতাড়িতের মতো। কতদিন পরে যেন ‘দিদা’ বলে ডাকল তাতাই। ভাবলেন চারুলতা।

মনে পড়ল না। কতদিন ওকে পুরো করে তাকিয়ে দেখেননি চারুলতা। তাও মনে পড়ল না, দেখলেন তাকিয়ে। নিয়মটা নাকি ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবু ছেলোটর মাথা এত রুক্ষ কেন?

চুলটা রুক্ষ শুকনো, পা ছোটো ধূলোমাখা।

দেখে ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠল।

অথচ দেখেছেন, অস্ত্রের অহুরোধ প্ররোচনা কোনো কিছুই কাজে লাগেনি, তাতাইকে চারুলতার কাছে বসানো যায়নি। অতএব নিজে আর সেই বুখা চেষ্টা করতে গেলেন না চারুলতা! ‘আয় বোস’ শব্দটাকে চৌচৌর আগা থেকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে ফেলে, বললেন, থলি কী হবে রে তাতাই?

স্বভাবগত অসহিষ্ণু স্বরকে অসহিষ্ণুতার উচ্চগ্রামে তুলে, তাতাই বলে উঠল, আছে দরকার! তুমি দাও তো!

কিন্তু থলি! থলিতে ভরে কী যেন সব আনা হতো, রাখা হতো।

কোথায় আছে ? আছে কি এখনো ?

মনে মনে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, চারুলতার আছে, এই ঘরেই আছে ।

পুজোর জিনিষ-টিনিষ কিনতে একটি বিস্তৃত থলি তোলা ছিল চারুলতার । স্বদৃশ্য মজবুত । ফলটল কিনতে যাতে বাঁধনটা না ঢিলে হয়ে যায় ।

বেশীদিনের নয় জিনিষটা । মনে হচ্ছে যেন ওই সেদিন, অই মাহুঘটা থলিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, ও বাবা ! বাজারের থলির এতো বাহার !

শুধু বাজারের বলা না, বল পুজোর বাজারের । পুজোর ফল কিনতে দরকার হলে, সেই আগে থেকে বাজারের থলিটা কেচে রাখতে হয়, তাই আলাদাই কিনলাম একটা ।

বেশ ! বেশ ! কিনলে কোথায় ?

মোল্লার দৌড় মসজিদে । কোথায় আবার । এই তোমার সামনের 'লক্ষী স্টোর্সে ।'

ও বাবা ! ওরা আবার এ সব জিনিষও রাখে ?

কত জিনিষই রাখে । তাকিয়ে তাকো কিছু ? নেহাৎ আজ রিক্সা থেকে নামার সময় চোখে পড়ল তাই ।

আলমারীর পিছনের দেওয়ালে পোতা পেরেকে টাঙানো থলিটা পেড়ে এনে নাতির সামনে ধরে বললেন, এতে হবে ?

চোখ দু'টো হঠাৎ উজ্জ্বল দেখালো তাতাইয়ের । ঠোঁটের কোনায় একটু যেন আলোর ঝিলিক ।

ফস করে হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিল ।

রংটা ময়লা হয়ে গেছে ছেলেটার, চামড়ার লালিত্যাও যেন কমে গেছে । অনেক অনিয়ম গেল বাজাটার ওপর দিয়ে । যাক, এবারে শান্ত স্থিরতার মধ্যে থাকতে পাবে, যত্ন পাবে ঠিক মতো । স্নেহে বুকে ভরে উঠছে চারুলতার ।

সঙ্গে সঙ্গে চোখটাও । তাতাইয়ের 'বড় হয়ে ওঠাটা' 'তিনি' দেখলেন না । কিন্তু চারুলতাই কি দেখতে পারেন ? ইচ্ছেও নেই ।

আবার অবকাশ, আবার ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া । কী আশ্চর্য, এইমাত্র ওই থলিটাকে নিয়ে যেন একটা আস্ত ছবি দেখলেন চারুলতা । প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী । অথচ এই ক'দিন ধরে শুধু ভেবে চলেছেন চারুলতা, আচ্ছা এই যে দীর্ঘকাল দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়ে এলেন অবিচ্ছিন্নভাবে ।

অথচ কিছুতেই মনে পড়েছিল না এতোদিন ধরে কী করেছেন তাঁরা ? দিনে রাতে

কথার চাষ, অথচ স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ছে নাকেন ? শুধু একটু ভঙ্গী, একটু একটু হাসি, একটু কথার টুকরো ।

চল্লিশ বছর ধরে কত কথা কইলেন, পরপর সাজিয়ে ধরে রাখতে পারছেন না কেন ?

হ্যাঁ, ক'দিন ধরে অবিরত এই ভাবনাই ভেবে চলেছেন চারুলতা : কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলেছেন ?

কোনো একটু ভালো কথা ? ভালবাসার কথা ? কিছুতেই যেন মনে পড়ছে না !
অবিনাশের মনের প্রাণের কথা বলতে, ইদানীং ছিল শুধু ছেলে, ছেলের বোয়ের ব্যবহারের সমালোচনা আর আক্ষেপ । কষ্ট হতো । তাই বলতে চাইতেন একটা প্রাণের মানুষের কাছে । কিন্তু চারুলতা ? চারুলতা কি এ চাণ্ড্যাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কোনোদিন ? একদিনের জগুও না ।

চারুলতা বকে উঠেছেন, থামো তো । মেয়েলিপনা করো না । আজকাল তো এই রকমই হয়েছে । ত্যাগে না ঘরে ঘরে ? তোমার গিন্নীর আমলটা আছে এখন ? তাই সেইরকম আচার আচরণ প্রত্যাশা করবে ?

অথচ চারুলতার মধ্যেও তো সেই একই অভিমান অভিযোগ পাক খেতো । প্রকাশ করতেন না । স্বীকার করতেন না । রেগে যেতেন অবিনাশ, বলতেন, তোমার প্রশ্রয়েই আরো আসপদ্দা বাড়ছে ।

চারুলতা দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিতেন । কারণ চারুলতা এগুলোকে খেলোমি মনে করতেন । প্রতিবাদ করতে গেলে ধুঁতা হবে বুঝতেন । তবু একবারও কী বলে ওঠা যেত না, সত্যি ! আমিও তো বুঝছি হাড়ে হাড়ে ।

নাঃ । বলেন নি কোনোদিন । ইদানীং তাই ভারী মনমরা হয়ে গিয়েছিলো মানুষটা !
ভাবতেন তাঁর কোনো দরদী নেই । বিশেষ করে শেষের এই দেড় দু'মাস ।
তাতাইকে নিয়ে চলে যাবার পর ।

ভাঙ্গা-চোরা সেই মানুষটার কাছে গিয়ে এ কথাও তো বলতে পারতেন চারুলতা
অত মন খারাপ করছো কেন ? ধরে নাও না থোকা বিলেত আমেরিকায় বদলী হয়ে গেছে । আজকাল তো হামেশাই এই দৃশ্য ! তবে ? আমরা তো আছি দুজনে একসঙ্গে !

নাঃ । এমন অস্বস্তিক ভঙ্গীতে কথা বলা ঠিক অভ্যাস ছিল না চারুলতার । এখন মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও, একটা কোনো ক্ষণ কি ফিরিয়ে আনা যাবে ?

মনোজ এসে দাঁড়াল ।

একা !

হ্যাঁ, অত্ৰকোনো সময় অমিতা স্বামীকে একা কোথাও না ছাড়লেও গোলমেলে সময়ে ছাড়ে ।

কী বলা হ'বে মাকে ?

এই বাড়িটা তো ছেড়ে দিতেই হবে। শুধু মাকে একা রেখে যাওয়া বলেই নয় (অমিতা বলেছে বিনা পয়সায় থাকার লোভ দেখালে তোমার আপনজনদের কেউ এসে থাকতেও পারেন) কিন্তু মাস-মাস এতোগুলো টাকা ভাড়াটা জোগাতে হবে না ? যতই আগের ভাড়া হোক মাসে দেড়শোখানি টাকা তো দিতেই হয়। তবে ?

অতএব ?

অতএব এখন চারুলাতাকেই নিয়ে যেতে হবে সংসার উঠিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে, বেহালার সেই 'শান্তিনিবাস'। যেখানে বাড়ির থেকেও আরাধ্য আয়েস, নিশ্চিন্ততা। ভালো ঘরে থাকা, ভালো খাওয়া দাওয়া, টি. ভি-তে দেখা আছে।

করতেই হবে সেটা।

অমিতা জোর দিয়ে বলেছে, আধুনিক জগতে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো 'মানব না' বললে চলবে কেন ? ওগুলো খুলেছে কেন ? চলছে কি জগে ?

মনোজ এল। প্রথমই অস্বস্তি এড়াতে তাতাইয়ের প্রশ্ন তুলল।

তাতাই কী করে বেড়াচ্ছে বল তো মা ? তোমার কাছ থেকে একটা ভালো থলি নিয়ে কী যে পুরছে তার মধ্যে ! জিগ্যেস করতে গেলাম তেড়ে মারতে এলো।

চারুলাতালি আলাগা ভাবে বললেন, কী পুরছে ?

মনোজ সহজ কথার স্রোতে ভাসতে ভাসতেই বোধহয় কুলে পৌঁছতে চাইছে।

তাই তাড়াতাড়ি বলে—

কী পুরছে সে ও জানে, আরও ভগবান জানে। সারা বাড়িতে, ছাত থেকে নাঁচে পর্যন্ত কী যে ওর রাজ-ঐশ্বর্য ছড়ানো ছিল। খুঁজে খুঁজে বার করছে, আর থলয় ফেলছে। ওর মা বুঝি বলেছিল, রাস্তার কাগজ-কুড়ানিদের মতো, ও কী হচ্ছে ? যত সব ভাঙা-চোরা ফাটা ফুটো মাল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল ? তো মাকে তো এই মারে কি সেই মারে। আবার কী শাসন, 'কক্ষণো আমার এ সব দেখবে না বলছি।' তা' অমিতা কোনো সময় দেখে নিয়েছে। বলেছে, নতুন খেলনার অভাব ওর ! তাই কোথা থেকে না কোথা থেকে কোন্ কালের কল ভাঙা মটরগাড়ি, ডানা ভাঙা এরোপ্লেন, মুখ ভাঙা ডটপেন, ফুটো হয়ে যাওয়া রবারের বল, এইসব জড়ো করছে নিয়ে যাবার জগে। তো দেখেছি বললে তো মাকে আন্তর রাখবে না।

চারুলাতা আস্তে বললেন, তা না দেখলেই হতো। শিশুর কাছে বিশ্বাসভঙ্গ করতে নেই। কী ভেবে যে কী করে ওরা।

আর কিছুই না। সম্পত্তি গোছানো হচ্ছে আর কী।

নিজেকে আলগা করে ভাসিয়ে দেয় মনোজ নামের অসহায় জীবটা।

তা' নাতির তো মালপত্তর গোছানো হলো ; এখন নাতির ঠাকুমার ব্যাপারটার কী হয় বল তো ?

চারুলতাও ছেলের মতোই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া গলায় বললেন, কিসের কী হয় ?

এই যে এখানের এই বিশাল মালপত্তর, এর সিকিও তো সেই ফ্ল্যাট বাড়িতে ধরবে না !

চারুলতা শান্ত গলায় বলেন, তাদের ঘরের সব কিছু নিয়ে যাচ্ছিস তো বৌমার বাবার দেওয়া খাট আলমারী আলনা আয়না টেবিল—

তা সেগুলো আর না নিয়ে গিয়ে উপায় কী ? লাগবেও তো।

সে তো সত্যি। লাগবে তো সবই।

তবে আমার এদিকের ডেয়ো ঢাকনা, আবোল তাবোল, যেমন আছে থাকগে। একে একে ধ্বংস হবে ! ও তো আর তাদের কাজে লাগবে না।

মনোজ ভুরু কুঁচকে বলে, একে একে ধ্বংস হবে ? বাড়িগুলোকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে না ?

চারুলতা বলেন, আরে ! বিনোদবাবু তোকে কিছু বলে নি ?

কী বলবে ? বিনোদবাবুর সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় নি।

তা বটে ও তো সদ্যবাস্ত মানুষ। কথা যা বলেছে, গিন্নীই বলেছে। ওর মেজমেয়ে লবঙ্গ, মনে আছে ছেলেবেলায় যাকে তুই স্ক্যাপাতিস, 'এই লবঙ্গ, আয় তোকে চিবিয়ে খাই।' তা তার বর নাকি কলকাতায় বদলী হয়ে এসে বাড়ি পাবে না, তাই গিন্নী বললো, ভগবানের ইচ্ছেয় মনোজের যখন নিজের বাড়ি হয়েছে, তো লবঙ্গরা এসে ওই রাস্তার ধারের পোরশনটায় থাকুক, আপনি আপনার এদিকে যেমন আছেন থাকুন। লবঙ্গর মাথার ওপর ছাতা, আপনি থাকবেন গার্জেন হয়ে।

মনোজ কি তার ভগবানকে উথলে উঠে ধন্যবাদ দেবে ? নাকি অপমানিত হয়ে রাগ দেখাবে ?

তা দুটোই করে মনোজ। গোড়ারটা মনে মনে, আর শেষেরটা মুখে।

ওঃ। তলে তলে এতোসব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ? তা আমাদের একটু জ্ঞানালে পারতে !

চারুলতা হঠাৎ একটু কঠিন স্বরে বলেন, আমি কোনো ব্যবস্থাই করিনি খোকা।

তলে তলে ব্যবস্থা করার যিনি মালিক তিনিই বরং চলেছেন। তা এ তো খুব

বিবেচনার কাজই করেছেন। সকলের অল্পকূলে যায়, এমন ঘটনা তো বড় সচরাচর ঘটে না।

চারুলতা এখন আবার নরম গলায় আস্তে বললেন, যিনিই ফেলেন তিনিই তোলেন।

মনোজ আর কথা বাড়াতে ভরসা পেল না। চলে যায় কর্ণধারের কাছে।

ওর চলে যাওয়ার বিপরীত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দেখেন চারুলতা। একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। ছেলেটার জন্তে বড় দুঃখ হয়।

দিদা!

তাতাই আবার এসে দাঁড়ায়।

স্কুলের বই নেওয়ার ভঙ্গীতে কাঁধে সেই থলিটা। এইটা তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখে দাও তো! ও ঘরে রাখলে মাম্মী পাজীটা ঠিক চুপিচুপি দেখে নেবে।

তাতাইয়ের মুখের মধ্যে একটা আঙুল।

আর একটা গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস পড়ে চারুলতার। ছেলেকে খুব বেশী ভাল করে মাহুষ করে তুলছে এরা! আরো ভালো করে মাহুষ করার জন্য চারুলতার সংসর্গ থেকে সরিয়ে নিতে এতো তোড়জোড় এত কাঠ-খড় পোড়ানো। চারুলতার থোকা কখনো এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতো? না কি ভাবতেই পারতো?

আস্তে বললেন, আচ্ছা! আমি ভাষণভাবে লুকিয়ে রাখবো।

নিয়ে নেন তাতাইয়ের হাত থেকে।

আলমারী খুলে কাপড় চোপড় সরিয়ে ঠেলে রেখে দেন সেই নানা বস্তুতে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে ওঠা থলিটাকে। তাতাইয়ের মুখে আলোর ঝিলিক। তবু বলল, আলমারিতে পুরছ? এসব নোংরা না?

ওমা! সে কী? তোমার দরকারি দরকারি জিনিসপত্র আবার নোংরা হতে পারে?

ঝিলিকটা এবার বলক হয়ে ওঠে। মুখে আঙুল দিয়েই বলে তাতাই, তুমি যে বলতে বড়, নোংরা বড় নোংরা, ময়দায় ঠেকবে, কুটনোয় ঠেকবে!

আহা! সে তো ময়দা, কুটনো। আলমারীর মধ্যে ওসব আছে?

আহা! চাবি বন্ধ করে দাও।

এই তো দিলাম।

চাবিটা লুকিয়ে রেখো, বাপী মাম্মী যেন দেখতে না পায়

ওরা আমার ঘরে আসে?

হ্যাঁ! আচ্ছা!

গোল গোল পা ফেলে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায় । সন্দের গলায় বলে, তুমি ভুলে ভুলে দেখে ফেলবে না তো ?

পাগল !

হুটমুখে চলে যায় ।

যিনি ‘ফেলেন’ এবং ‘তোলেন’ তিনি যে হঠাৎ এতই বিচক্ষণ হয়ে উঠবেন, এটা ধারণাতীত ।

অমিতার মা বললেন, এ শুধু ‘সন্তোষী মার’ দয়া । আগে বড়দির ব্যাপারে হাসতাম, এই তো বাবা প্রত্যক্ষ দেখলাম ! তা মানতে হবে ‘প্রত্যক্ষ’ । তবু সমস্তার যখন এতো সুন্দর সমাধান ঘটে গেল, তখন অনায়াসেই সৌজ্ঞ্য করা যায় প্রাণথুলে ।

এবং সেই স্মরণটা বজায় রাখতে আহত উত্তেজিত ভঙ্গীতে এসে বলা যায়, মা, আপনি নাকি আমাদের সঙ্গে ও বাড়ি আসছেন না ?

চারুলতা একটু হেসে বললেন, তোমাদের সঙ্গেই তো সর্বদা আছি বোমা । তবে বলতে পারো শরীরটাকে এখানেই ফেলে রাখছি ।

ও তো একটা ইয়ে কথা । আমরা আপনজনরা থাকতে আপনি পরের ভরসায় পড়ে থাকবেন ? ওই লবঙ্গ না কে—

কথাটা কিন্তু উল্টো বোমা । আমি লবঙ্গর ভরসায় থাকতে বসি নি, লবঙ্গই বরং আমার ভরসায়—ওর মা আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে যাবেন না মাসিমা, আমি বরাবর জানি, এ আপনারই বাড়ি ।

ওঃ ! অমিতা আসল কথায় আসে, তা’ ভাড়ার ব্যবস্থা কী হলো ?

আর বোলো না মা ! বলে ভাড়া আপনাকে দিতে হবে না, একখানা ঘর নিয়ে থাকবেন বৈ তো নয় । তো সেটা অবিশ্তি কাজের কথা নয় । দেব কিছু । তা মে আমার থেকেই কুলিয়ে যাবে ।

‘চারুলতার থেকে’ কথাটার মানে ‘বিধবা পেনসন’ না কি যেন পাবেন তিনি অবি-নাশের অফিস থেকে ।

কথাটা বলেই তাড়াতাড়ি সামলান চারুলতা, আসলে এতো অল্পনয় বিনয় করছে ! ‘না’ করা গেল না । ওদেরও তো একটা মস্ত উপকার । কাচ্চা-বাচ্চার মা, বরের না কি কেবলই ট্যুরে যেতে হয় । একটা পাহারাদার রইল আর কি !—হাসলেন একটু ।

পাহারাদার ! অমিতা ভুরু কৌচকালো ।

অন্য একজন মুফতে একটা পাহারাদার পেয়ে যাবে ! এওতো বিরক্তিকর । সেই

পাহারাদারটা যখন নিজের সম্পত্তি। সেই বিরক্তিতাই প্রকাশ করে অমিতার মুখ-
চোখ, কণ্ঠস্বর। (হুঁ ! স্বার্থ ! ষোলোআনা স্বার্থ। তাই উদারতা, 'ভাড়া দিতে হবে
না'।) যাক অসুবিধে হলেই চলে আসবেন। দ্বিধা করবেন না।

তাতাই যে কখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বসে আছে কে জানে। বীরবিক্রমে বলে
ওঠে, বলেছি না, দিদা কখনো নতুন বাড়িতে যাবে না। এইখানে থাকবে। চিরকাল
থাকবে।

ওঃ তাতাই ! এতো অসভ্য হয়ে যাচ্ছ কেন তুমি ? দেখতে পাচ্ছো তোমার এই
রকম অসভ্য কথার জন্তে দিদা রাগ করে যেতে চাইছেন না।

আহা কী যে বল বোঁমা ! ছেলেমানুষ, কী ভেবে কী বলে। ওকথা বলে ওর মনে
কষ্ট দিও না !

মাম্মীর কথায় মনে কষ্ট হতে আমার ব্যয় গেছে।

তাতাই বীরদর্পে বলে, মাম্মী তো মনে কষ্ট দেওয়ার রাজা। বাপীকে মনে কষ্ট দিয়ে
দিয়ে তো মেরে ফেলে একেবারে।

চলে যায় তার সেই ধপধপে গোলানো গোলানো পা ফেলে।

আচ্ছা ! ঠিক আছে। অমিতার দিন আসছে। কী করে ওই বেয়াদা বনে যাওয়া
ছেলেকে শাস্তি করতে হয়, তা দেখিয়ে দেবে।

অবশেষে সেই দিনটি আসে।

এতো হিজিবিজির পর আর 'গৃহপ্রবেশের' ঘটনার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া মূল
প্রবেশকারীর গ্যাড়া মাথায় সম্যক চুল না গজানো পর্যন্ত, পাঁচজনকে ডাকার কথা
ভাবা যায় না কি ?

তবু একটা শুভদিন দেখে যাওয়া !

অনেক অপেক্ষান্তে সেই শুভদিন এলো।

যাত্রাকালে অমিতার বাবা এলেন।

নিজের গাড়িটা করে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। মা তো আসবেনই।

অমিতার মা বেয়ানকে বললেন, বুঝতেই পারছি, আপনার ঠাকুর দেবতা শুচিবাই-
টুচিবাইয়ের ব্যাপার ওদের ওখানে অসুবিধে হবে ভেবেই এমন একটা অদ্ভুত ভিসি-
শান নিলেন বেয়ান ! মিতু খুবই মর্মান্বিত হয়েছে।

চারুলতা আস্তে বললেন, তা' নয় তাই। বাড়িটার অনেক স্থিতি জড়ানো !

হ্যাঁ, তা অবিশিষ্ট ঠিক।

বেয়ানের স্বর সহৃদয়। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলার কিছুই নেই ! ওরে মিতু

আর দেবী করিস না। তোর বাপীর তো আবার সেই ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’, ‘অমৃত যোগ’
অনেক প্রেজুডিস!

চারুলতা বললেন, থোকা, তোরা দুজনে নতুন কাপড় পরেছিস ?

হঁ। তো আয়, ছেলে নিয়ে এখানে এসে তিনজনে ঘট প্রণাম করে যা।

ছেলে নিয়ে।

আরে তাই তো। ছেলেটা কোথায় ?

ওমা সে কি ! খোজ খোজ। হৈটচ পড়ে যায়। নাঃ। ভয়ের কিছু না। ছাতে একটা
ঘুড়ি কেটে পড়েছে দেখে নিতে ছুটেছিল। ঘুড়িটা ছাতে পড়ে থাকবে ? এ হয়
নাকি ?

এসে বলল, ঘটি আবার প্রণাম করব কী ? হি হি, ঘটি একটা মাহুষ নাকি ?

বেশ বাবা করিস না।

ও বাড়ির দিদিভাই বলে ওঠেন, তা অ মিতু ! এখন এই যাত্রার সময় একটা
কাটা ঘুড়ি হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠবে তাতাই ?

তাতাই ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তোমায় বলেছে—ঘুড়ি নিয়ে উঠবে। সব সময় সর্দারী !
দিদা, তুমি এই ঘুড়িটা এক্ষুণি তোমার ঘরে উচ্চু আলমারীর মাথায় তুলে
রাখ তো।

আমার ঘরে !

চারুলতা বিমূঢ়ভাবে বলেন, বেশ। ঘরে ঢুকে যান ঘুড়ি হাতে।...আর পরক্ষণেই
ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তাতাইয়ের সেই মালপত্রের ঝোলাটি হাতে নিয়ে।
বলে ওঠেন, আরে দাদুসোনা, তোমার দরকারি দরকারি জিনিসপত্র য়ে পড়ে
থাকছে। এই নাও।

অমিতার বাপী অস্থির গলায় বলেন, উঃ অনেক দেবী হয়ে যাচ্ছে। ওসব এখন
থাক থাক।

থাকবেই তো—

তাতাই দৃষ্ট কণ্ঠে বলে, দিদা ! এটা এখন তোমায় কে বার করতে বলেছে শুনি ?
এখন নেব বলেছি ?

তারপর ঘুরে দাঁড়াবার আগে একটি অমোঘগলায় বলে ওঠে, চিরকার এখানে
থাকবে। যখন বাপীর মতো বড় হবো, যখন আমি আমার বোকে নিয়ে, মাম্মীকে
‘কলা কলা’ করে এখানে চলে আসবো, তখন নেবো। ঘুড়িটাও নেবো তখন।
হারিয়ে ফেলো না !—চলে যায় গটগটিয়ে মা বাপের আগে আগে।